শুকতারা

মহাকাশের আজব দেশে

সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ · ১৪০১

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ডায়মন্ড কমিক্‌সে

কার্টুনিষ্ট প্রাণের চিরনতুন চরিত্র

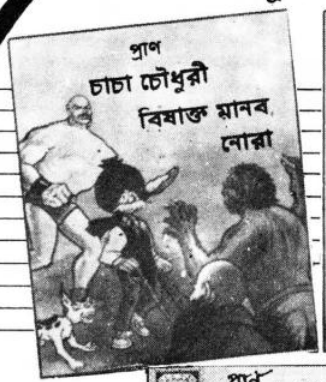

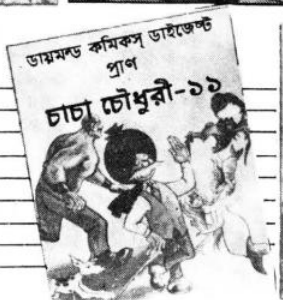

কুরুক্ষেত্রে হওয়া কুরু-পান্ডবের ধর্ম-যুদ্ধের অত্যন্ত সজীব চিত্রন। যে যুদ্ধে পান্ডবেরা বিজয়ী হয়েছিল। যে কোনও বয়সের পাঠকের জন্য অত্যন্ত রোচক এবং সংগ্রণীয়। মূল্য- 15/-

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামের ঘটনা প্রধান জীবনের অত্যন্ত রোমাঞ্চক কাহিনী। বাচ্চা-বুড়ো সবার জন্য সমান-ভাবে মনোরঞ্জক। মূল্য- 15/-

ডায়মন্ড কমিকস্ প্রা. লি. ২৭১৫, দরিয়াগঞ্জ, নূতন দিল্লী-১১০ ০০২

বাঁটুল দি গ্রেট

আজ রাতে নতুন বছরের পার্টির জন্যে খাবার টেবিল সাজিয়ে রাখলুম!
হাঃ! আমাদের জন্যে ওর একটা খাবারও নয়! পার্টি শুরুর আগেই আমাদের শুতে পাঠানো হবে!

উটো হ্যাণ্ডবেল বাজানো প্র্যাকটিস করছে– আমি চাই এটা তুই আজ মাঝরাত্রি বারোটার সময় করবি!
শোন, ঐ পার্টির খাবার থেকে আমাদের ভাগ পাবার একটা ভালো প্ল্যান আমি পেয়েছি–

আহ্! এইযে ফোন এসে গেছে!
ক্রীক ক্রীক! ক্রীক ক্রীক!

কি ব্যাপার? গুপে গুণ্ডার অত্যাচার? কোথায়?-বড় রাস্তার পাশে সিনেমা হলের সামনে! আমি এখুনি যাচ্ছি,

টেলিফোন
ঐ যে বাঁটুলদা যাচ্ছে! এবার আমরা চুপিসাড়ে বাড়িতে ঢুকে নয়া বছরের পার্টির খাবার কিছুটা সাবাড় করতে পারি!

কোথায় তারা? কোথায় গুপে গুণ্ডা?
কিসের গুণ্ডা?

বড় রাস্তার ওপরে গুপে গুণ্ডার দল অত্যাচার করছে। একজন ফোন করে আমাকে এই কথা বললো!
হাঃ হাঃ! কেউ তাহলে তোমার সঙ্গে রসিকতা করেছে, বাঁটুল। 'গুপে গুণ্ডার অত্যাচার' একটা সিনেমা ছবির নাম!
গুপে গুণ্ডার অত্যাচার

আমাকে ওদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে পার্টির ভোজ্য থেকে চটপট কিছু জিনিস হাতানো!

সাবাশ, উটো! ও ওদের পাকড়েছে! তুই একটা রক্ষীর কুকুরের চেয়েও ভালো, উটো!

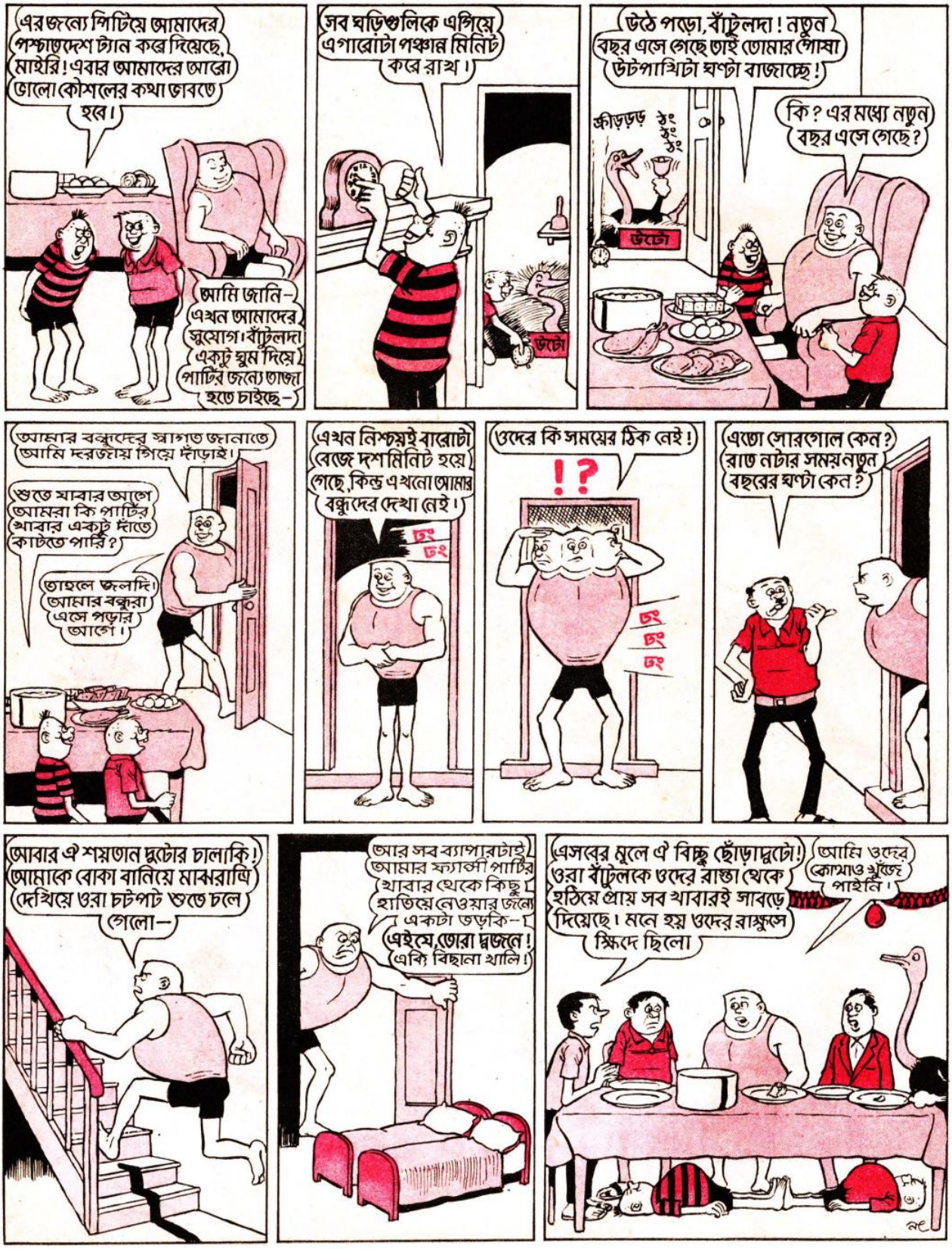

এর জন্যে পিটিয়ে আমাদের পশ্চাতদেশ ট্যান করে দিয়েছে, মাইরি! এবার আমাদের আরো ভালো কৌশলের কথা ভাবতে হবে।
আমি জানি– এখন আমাদের সুযোগ। বাঁটুলদা একটু ঘুম দিয়ে পার্টির জন্যে তাজা হতে চাইছে–
সব ঘড়িগুলিকে এগিয়ে এগারোটা পঞ্চান্ন মিনিট করে রাখ।
উটো
উঠে পড়ো, বাঁটুলদা! নতুন বছর এসে গেছে তাই তোমার পোষা উটপাখিটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে!
ক্রীড়ড়ড়
ঠং ঠং ঠং
উটো
কি? এর মধ্যে নতুন বছর এসে গেছে?
আমার বন্ধুদের স্বাগত জানাতে আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়াই।
শুতে যাবার আগে আমরা কি পার্টির খাবার একটু দাঁতে কাটতে পারি?
তাহলে জলদি। আমার বন্ধুরা এসে পড়ার আগে।
এখন নিশ্চয়ই বারোটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো আমার বন্ধুদের দেখা নেই।
ঢং ঢং
ওদের কি সময়ের ঠিক নেই!
!?
ঢং ঢং ঢং
এতো সোরগোল কেন? রাত নটার সময় নতুন বছরের ঘণ্টা কেন?
আবার ঐ শয়তান দুটোর চালাকি! আমাকে বোকা বানিয়ে মাঝরাত্তির দেখিয়ে ওরা চটপট শুতে চলে গেলো–
আর সব ব্যাপারটাই আমার ফ্যান্সী পার্টির খাবার থেকে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে একটা ভড়কি–
এইযে, তোরা দুজনে! একি বিছানা খালি!
এসবের মূলে ঐ বিচ্ছু ছোঁড়াদুটো! ওরা বাঁটুলকে ওদের রাস্তা থেকে হঠিয়ে প্রায় সব খাবারই সাবড়ে দিয়েছে। মনে হয় ওদের রাক্ষুসে ক্ষিদে ছিলো
আমি ওদের কোথাও খুঁজে পাইনি।

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ ১৪০১
মে, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ
মহাকাশের আজব দেশে
—নারায়ণ দেবনাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ—
স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০

ধারাবাহিক
অরণ্যপতি টারজান—সব্যসাচী ১২

গল্প
বাবলুর ছবি আঁকা
—বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ৩১
সে এক অজানা দেশ
—তরুণ শংকর ৩৫
মনের জোরে সাহস বাড়ে
—জীবনময় গুহ ৬৩

রূপকথার গল্প
বুবুন আর আকাশপরী—নীলা কর ৬

ভূতের গল্প
মিনুর জেঠু—রণেন বসু ২২

হাইজ্যাকিংয়ের গল্প
মাঝ আকাশে হা-রে-রে-রে
—বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৩

ইতিহাসভিত্তিক গল্প
কোহিনূর—হিরণ্ময় রায় ৬৬

বিজ্ঞান বিচিত্রা
মন্ত্র থেকে মাদুলি
—ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২৮

পুরস্কৃত গল্প
শিক্ষা (প্রথম)—এলা নাগ ৫১
চিঠি (দ্বিতীয়)—জয়িতা পাল ৫১

বীর বাঙালী
কৌশলী দনুজমাধবদেব
—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০

ফিচার
বিষে বিষক্ষয়—পথিক মণ্ডল ২০
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ২৫
ভবিষ্যতের ঠিকানা
—ডি· এ· চন্দ্রন ৪৮

বিশ্ববিচিত্রা
জিজ্ঞাসা ৬৫
সত্যি! ৬৯

কবিতা
ভোজবাজী—প্রবোধ নাথ ৫

ক্রীড়াঙ্গন
খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
পড়ার সঙ্গে খেলা
—শ্রীমতী সর্বাণী মুখোপাধ্যায় ৬১
গোলের পেছনে ছোটেন ইতালির
সিলাচ্চি —সুমন ভট্টাচার্য ৬০
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৬২

বিভাগীয় লেখা
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪০

ছবিতে গল্প
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৬
সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক
অভিযান (রঙিন) ১৮
তিতলির যাদু-পুতুল—পল্লব
পূততুণ্ড ও দোলা পূততুণ্ড ৩৮
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ২৬

ঘোষণা
নিতাইলাল সাহা স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতা ৫২
জানো কী ৪২

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

নিউ বেঙ্গলের সাহিত্য সম্ভার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিদেশিনী

অগ্নিমিত্রর
দেশ থেকে দেশান্তর

ডঃ দীপক চন্দ্রর
হরিবংশ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **ক্রিকেট মাঠের বাইরে**

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার দোলায় দুলিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরুলো।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যর
পেরুতে সূর্য লাল

দিলীপ ভট্টাচার্যর
প্রবাস প্রেম

আভা বসুর
সাগর দুহিতা

দেবনারায়ণ গুপ্তর
বাংলার নট-নটী

শতদল ভট্টাচার্যর
নিশুতি রাতের মহাত্মা

ময়ূখ চৌধুরীর
দেবী দর্শন

ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর
বিপন্ন প্রকৃতি

রাধারমণ রায়ের
অদ্ভুত গোয়েন্দা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন
ফুটবল ক্রিকেটের আইন

দীপঙ্কর বিশ্বাসের
মজানো দশ

অরুণ সর্দারের
অনাহূত

আশুতোষ মন্ডলের
নতুন আলো

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

শুকতারা

৪৭শ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • জ্যৈষ্ঠ ১৪০১/মে ১৯৯৪

ভোজবাজী

প্রবোধ নাথ

ও দ্বিজদাস! ব্যস্ত কেন? কি আছে ঐ হাঁড়িতে?
লোক এসেছে? মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছ কি তাই বাড়িতে?
বেশ তো যেও, তার আগে ভাই একটা কথা বলে নি,
কালিদাসের আপন পিসে আজও আমায় ভোলেনি।
মানুষটাকে পড়ছে মনে? বেঁটের ওপর লম্বা,
ফুট পাঁচেকের ওপর হবে, হতেও পারে কম বা।
তার কাছে ভাই ঘুরে এলাম, শিখে এলাম ভোজবাজী,
যাদুর যেটা গোপন খেলা—পাঁচ আঙুলের কারসাজি।
শিখেছি কী? বললে মুখে পারবে কি হে বুঝতে!
পারবে কি হে বুদ্ধি দিয়ে ভোজের বাজী যুঝতে!
আচ্ছা, ধরো ঐ যে দূরে বসে আছে পক্ষী,
মন্ত্র পড়ে হাপিস করা এমন কি আর ঝক্কি!
ভাবছ বুঝি বকছি বাজে? নেই কো জানা ভেল্কি?
একটু দাঁড়াও, দেখিয়ে দিই আমার হাতের খেল কী।
দাও তো তোমার হাঁড়িখানা, একটু দাঁড়াও চুপ করে
দু'চোখ বুজে তালি বাজাও গণ্ডা পাঁচেক খুব জোরে।
এবার আমি মন্ত্র পড়ি—আয়রে উড়ে লঙ্কা।
ও দ্বিজদাস! চোখ মেলে চাও, হাঁড়ির মিঠাই ফক্কা।

ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

বুবুন আর আকাশপরী

নীলা কর

পাখিটা ডাকছিল অনেকক্ষণ থেকে।

পাখিটার ভাষা বুবুন বোঝে, সব বুঝতে পারে। ও বলছিল, বুবুন আমি তোমায় অনেক দূরে সেই সবুজ পাহাড়ের দেশে নিয়ে যাব। ওখানে নীল আকাশের গায়ে রামধনুর সিঁড়ি আছে। আর ওই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠলেই দেখবে খুব সুন্দর একটা কাচের ঘর। ওখানেই শুয়ে আছে আকাশপরী।

জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের নরম আলো এসে পড়েছে। ঘুমটা ভেঙে গেল বুবুনের। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল বুবুন। চোখটা খুলেই ও দেখতে পেল জানলার খড়খড়িতে বসে আছে ছোট্ট

টুনটুনি। নেচে নেচে দুলে দুলে ও মিষ্টি সুরে বলতে লাগল, ভোর হয়েছে, বুবুন সোনা আর ঘুমিও না, খেলবে চল। বাগানের শিশিরে এখন মুক্তামানিক। শিউলিতে সবুজ ঘাস ছেয়ে গেছে। ওখানে তোমার বন্ধুরা সবাই জড়ো হয়েছে দেখবে চল।

বুবুন ধড়মড় করে উঠে বসলো। টুনটুনি রোজই নানা কথা বলে ওর ঘুম ভাঙায়। আজও নানা কথা বলে বুবুনের ঘুম ভাঙাচ্ছিল ও। বিছানায় বসে থেকেই বুবুন ভাবলো, আশ্চর্য, স্বপ্নের পাখিটার সঙ্গে টুনটুনির খুব মিল আছে তো। ও টুনটুনিকে বললো, তুমি যাও, আমি এক্ষুণি ছুটে যাচ্ছি।

কিন্তু এক্ষুণি ছুটে যাবে কি করে? ওর তো একটা পা নেই বললেই চলে। সরু পাঁকাটির মতো পা'টায় ও কোনো জোর পায় না। দাঁড়াতেও পারে না ভাল করে, ছুটবে কি করে। টুবাই, টুকটুক, রিঙ্কু কেমন সুন্দর ছোটে ওরা। ছুটতে ছুটতে কত দূর চলে যায়। বুবুন পারে না। একদম পারে না। ভীষণ কান্না পায় বুবুনের। রোগা লিকলিকে পা-টার ওপর রাগ হয়। ভেংচি কাটে পা-টাকে।

বুবুনের মা কাছাকাছিই থাকে। বুবুনের দুঃখের সব কথা মা বুঝতে পারে। রোজ ভোরে বুবুনকে কোলে করে নিয়ে যায় ওদের বিরাট বাগানে। বাগানের ঠিক মাঝখানে আছে মস্ত বড় একটা পুকুর। তার পাড়েই স্বর্ণচাঁপার গাছ। গাছের নিচে শান বাঁধান চাতালে বসিয়ে দেয় বুবুনকে। ওখানে বুবুনের অনেক অনেক বন্ধু আছে যে। টুনটুনি, কাঠবড়ালী, কালো কোকিল, সবুজ টিয়া, সাদা খরগোশ, গাং-শালিক, মাছরাঙা, গিরগিটি, প্রজাপতি। আর আছে লালমোহন, নীলচে কালো ভ্রমর। এমনকি ছোট্ট ছোট্ট খয়েরি রঙের মৌমাছিদের সঙ্গেও বুবুনের ভারী ভাব। ওরা সবাই বুবুনের অপেক্ষায় থাকে। বুবুনকে সবাই খুব ভালবাসে। ছোট্ট ফুটফুটে এইটুকু ছেলে বুবুনের পা নেই বলে ওদের ভারী দুঃখ। বুবুন ওদের সবার কথা বোঝে। এমনকি বাগানের দোলনচাঁপা, হাসনুহানা, স্বর্ণচাঁপা, চামেলি, বকুল, গন্ধরাজ ফুলেদেরও স....ব কথা ও বোঝে। তাই ভোর হলেই ও বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে বাগানে যাওয়ার জন্য ছটফট করে। মা সে কথা টের পায়। তাই ঘুম থেকে জেগে উঠলেই মুখ ধুইয়ে দুধ আর বিস্কুট খাইয়ে বুবুনকে বাগানে বসিয়ে দিয়ে আসে।

বুবুনের সবচেয়ে বড় সঙ্গী বাড়ির পোষা দু'টি কুকুর রোজি আর ব্ল্যাকি। রোজি ছোট্টখাট্ট, নরম নরম সোনালি রঙের একরাশ লোমে মোড়া। ওকে দেখলে কখনো বড় সোনালি খরগোশ মনে হয়, কখনো বা মনে হয় বড় সোনালি গিনিপিগ। ব্ল্যাকিকে দেখলে মনে হবে একটা কালো ভল্লুক কিংবা কালো বাঘ। কালো কুচকুচে নরম লোমে ঢাকা শরীর থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়ে। ভীষণ তেজী ও। গম্ভীর গলার স্বর। কিন্তু বুবুনের বড় বাধ্য। কেমন নরম নরম চাউনিতে বুবুনকে দেখে আর কালো ঝালরের মতো লেজটা নাড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই বুবুন রোজ ওদের দরজার পাশে দেখতে পায়। মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে ওরা। মা বুবুনকে বাগানে নিয়ে এলে ওরা নাচতে নাচতে সঙ্গে আসে। বুবুনের সঙ্গে কতরকম খেলা করে। ছোট্ট লাল বলটা বুবুন যতবার ছুঁড়ে দেয় ঝোপেঝাড়ে, ওরা ঠিক মুখে করে কুড়িয়ে বুবুনের কাছে এনে দেয়। বুবুনের মজা লাগে। খেলা জমে ওঠে। বুবুন জানে রোজিটা একটু হিংসুটে। ব্ল্যাকিকে একটু বেশি আদর করলে ও কুঁইকুঁই করে বুবুনের কোল ঘেঁষে বসে মুখটা উঁচু করে ধরে বুবুনের মুখের কাছে। বুবুন ওর নরম ঝোলান কানের দুপাশে হাত দিয়ে কপালে চুমো খায়। ওমনি রোজি ছুটে যায় বাগানে। প্রজাপতি আর ফড়িং-এর সঙ্গে ছোটাছুটি করে।

ইশারায় আমায় কাছে ডাকল

গন্ধরাজের গাছে দোল খেতে খেতে লালমোহন পাখি বললো, জানো বুবুন গতকাল আমি না এক অদ্ভুত জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটা পাহাড় আছে। পাহাড়টার গা বেয়ে একটা ছোট্ট ঝরনা নুড়িপাথরে তাল দিতে দিতে অদ্ভুত সন্দর গান গাইছিল।

কালো কোকিল উড়ে এল ডানা মেলে, তাই নাকি? গান গাইছিল বুঝি! কেমন গান বল তো?

লালমোহন লাল গলাটা উঁচুতে তুলে মাথা কাৎ করে বললো, উঁহু, বলবো না। আমি সে গানটা শুধু বুবুন সোনাকে শিখিয়ে দেব।

আহা! ভারী হিংসুটে তুমি, বলই না—কালো চোখের কালোমণি ঘুরিয়ে কোকিল বললো।

বুবুন বললো, হ্যাঁ ভাই, লালমোহন তুমি ওকেই শিখিয়ে দাও না। ওর গলায় কত সুন্দর সুর, ও ঠিক শিখে নেবে। ওকেই তুমি শিখিয়ে দাও।

কুটুস্ কুটুস্। —এ্যাঁ! ও বুঝি একলাই শিখবে, আর আমরা? ঢাকের পালকের মতো বাঁকানো লেজ তুলে ছুটে এল কাঠবিড়ালী।

হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই.....

গুনগুন করতে করতে কালো ভ্রমর আর মৌমাছিরাও এল ছুটে। লালমোহন ব্যাপার দেখে মিটিমিটি হাসে আর গলার লাল রঙে ঢেউ খেলায়।

সাদা খরগোশ এতক্ষণ খুব ব্যস্ত ছিল ঘাসের গোড়া খুঁড়তে। গানের কথা শুনে সেও থুপথুপ করে লাফিয়ে এল। কান দু'টো টানটান করে লাল গোল গোল চোখে সবার মুখের দিকে চাইল।

বকুল গাছের ডালে সবুজ গা লুকিয়ে টিয়া এতক্ষণ জুলজুল দেখছিল ব্যাপারখানা কি! কিন্তু আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। চাঁপার নিচু ডালে উড়ে এসে বসলো। গানের কথা শুনে নেমে এল বুবুনের ঘাড়ে। ওর গলাটা কর্কশ বলে বড় ঠাট্টা করে সবাই। কিন্তু গান শিখতে কার না ইচ্ছা হয়। কেবল বুবুন ঠাট্টা করে না। তাই যত কথা ও বুবুনের সঙ্গে বলেই সুখ পায়।

লালমোহন বললো, বেশ গানটা না হয় শিখিয়েই দেব। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল তাই শোন আগে।

পুকুরধারে এতক্ষণ একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল মাছরাঙা পাখি। গাং-শালিকও ফুরুৎ ফুরুৎ ওখানেই ঘুরছিল। তক্কে তক্কে ছিল নিশ্চয়। গানের জন্য ওদের তেমন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তাই বলে গপ্‌পো শুনবে না?

অমা, গপ্‌পো আছে বুঝি! ও ভাই লালমোহন, তুমি গপ্‌পোটাই আগে বল, আমরা শুনবো।

টুনটুনি এতক্ষণ দোলনচাঁপার ফুলের পাপড়িতে আলতো করে বসে দোল খাচ্ছিল। গল্পের গন্ধে ও-ও চাঁপার ডালে এসে বসলো। সোনালি চাঁপায় হালকা পা রেখে চেয়ে রইল লালমোহনের দিকে।

জলের নিচে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে একটা সাদা ঝকঝকে মাছ তুলে এনেছিল পানকৌড়ি। কিন্তু খাবার ফুরসুৎ নেই এখন। লালমোহন নাকি গল্প বলছে। গল্প শুনতে ওর ভারি ভাল লাগে।

লালমোহন বললো, দেখ, আমি অনেকদিন আপেল খাইনি। তাই ক'দিন থেকেই খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আপেল খাব। কিন্তু এখানে ধারে কাছে তো আপেল নেই। অনেকদিন আগে একটা শঙ্খচিল আমায় বলেছিল যে এখান থেকে উত্তর-পুব দিকে বিরাট একটা পাহাড় আছে। ওখানেই আপেল গাছে অনেক আপেল আছে। আমার খুব সাধ হলো ওই পাহাড়ে গিয়ে আপেল খেয়ে আসি।

টিয়া বললো, তুমি গেলে বুঝি?

হ্যাঁ, আমি সেখানেই যাব বলে উড়ে গেলাম। উড়ছি, উড়ছি, উড়ছি। কত কত ছোট নদীর ওপর দিয়ে উড়ে গেলাম। কত মাঠ, বন আর লাল সুরকি মোড়া কাঁকুরে পথ পেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পাহাড় চোখে পড়ে না। যাচ্ছি যাচ্ছি আর যাচ্ছি। বুঝতে পারছিলাম যে আমি মেঘেরও উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। গায়ে ধোঁয়া মাখা হিমেল ছোঁয়া। মাঝে মাঝেই চোখটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মেঘ সরে গেলেই আবার দেখছি আমার নিচে আঁকা ছবির মতো পড়ে রয়েছে সবুজ মাঠ, ছোট-বড় কতরকম গাছ। হয়তো তাতে ফুল আছে। হয়তো বা ফলও আছে। কিন্তু আমি

এত উঁচু থেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। রুপোর জলের মতো নদীগুলো এঁকে বেঁকে রয়েছে। কিন্তু পাহাড় দেখতে পাচ্ছি না। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি ভুলপথে এলাম? কিন্তু শঙ্খচিল তো উত্তর-পুব দিক দিয়েই যেতে বলেছিল। আমি থামলাম না। এক সময়ে দূরে, অনেক দূরে মনে হলো আকাশের চেয়েও ঘন আকাশী রঙের একটা মেঘ আকাশের ধার ঘেঁষে উঠে আসছে। বেশ ঘন নীল। কখনো কখনো কালচে নীলও যেন মনে হচ্ছে মেঘটাকে।

সবাই এতক্ষণ মন দিয়ে ওর কথা শুনছিল। হঠাৎ কাঠবিড়ালী নড়ে চড়ে উঠলো, বল কি! কালো মেঘে যে ঝড় বৃষ্টি হয়। অচেনা জায়গায় তুমি কোথায় বা মাথা গুঁজবে? ভারি বিপদ তো!

টুনটুনিরও ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ও-ও বললো, বিপদই তো, ভারি বিপদ! অত দূরে অচেনা দেশে কোথায় বা ও দাঁড়াবে!

কোকিলও চিন্তিত বেশ। বললো, কি করলে তখন তুমি?

আরে মেঘ কোথায়! মেঘই না ওটা।

তাহলে? বুবুন আর থাকতে পারলো না। জিজ্ঞাসা বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

রোজি ব্ল্যাকিও বুবুনের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো, তাহলে? ওটা কী?

পাহাড়।

সবাই চিৎকার করে উঠলো, পাহাড়? ও মা পাহাড়? পাহাড় বুঝি মেঘের মতো হয়?

দূর বোকা সব। মেঘের মতো হবে কেন? অনেক দূর থেকে দেখেছি তো তাই অমন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। আসলে পাহাড় পাহাড়েরই মতো দেখতে।

বুবুনের চোখে অনেক বিস্ময়। পাহাড় কেমন বল না লালমোহন।

অনেক উঁচু নিচু তালতাল পাথর ভরা তার বুক। কত উঁচু জান? মেঘ দেখেছ? মেঘের চেয়েও উঁচু। এত উঁচু যে তোমার মনে হবে আকাশটাকেই বুঝি পাহাড় ছুঁয়ে দিয়েছে। কত রকম, কত রঙের পাথর, সে আমি বলতে পারবো না। তাতে ছোট বড় কত কত গাছ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুক চিরে একরাশ জল নাচতে নাচতে নিচে নেমে গেছে।

জল! পাহাড়ের বুক চিরে জল! সে কেমন? গন্ধরাজ মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, কাচের মতো ঝকঝকে জল! কোথাও সরু একফালি রুপোর পাতের মতো। কোথাও বা অনেকটা জায়গা জুড়ে পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে পাহাড়েরই বুকে ঝাঁপিয়ে নেমেছে। কি সুন্দর তার শব্দ। যেন দেবতার গান। ঝাঁপিয়ে নামা জলের গুঁড়ি রোদ্দুরে সোনার ফুলকি হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

বুবুনের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, বাঃ কি সুন্দর!

একজনের কাছ থেকে পরে জানতে পারলাম তাকে ঝরনা বলে।

কে? কার কাছে? চাঁপা মাটিতে প্রায় লুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আঃ, থামোই না, বলবো, সব বলবো। একটু ধৈর্য ধর। শোন, আমি তখন যেন ডানায় নতুন করে শক্তি পেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি উড়ে যেতে লাগলাম পাহাড়ের কাছে। তখন আর তাকে একটুও নীল মেঘ বলে মনে হচ্ছে না। সব দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। কত কত রংবেরঙের গাছ, ফুল, লতাপাতা। কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। আরও কতক্ষণ উড়েছি জানি না। হঠাৎ দেখি পাহাড়ের মাথায় তাল তাল বরফ।

বরফ! ও মা বরফ! কি মজা। তুমি বরফ খেলে? কেমন খেতে? আইসক্রীমের মতো? বুবুন ধৈর্য রাখতে পারছে না যেন।

দূর! সে বরফ আবার খাওয়া যায় নাকি! জমাট বাঁধা তালতাল বরফ। এত বরফ যেন মনে হচ্ছে আকাশের আধখানাই বরফ দিয়ে মুড়ে দিয়েছে কেউ।

বাবা, তাই বুঝি? মাছরাঙা দু'বার লেজটা মাটিতে নামিয়ে বললো।

হ্যাঁ। আর সে কি শীত! কনকনে শীত। কিছুদূর যেতে না যেতেই মনে হলো আমিও বরফ হয়ে যাব। নিচের দিকে নামতে লাগলাম। কিন্তু নামতে ইচ্ছে করছে না। সূর্যের রং বরফের গায়ে পিছলে পড়ে কেমন রামধনুর সিঁড়ি হয়ে গেছে।

রামধনুর সিঁড়ি! ওমা সত্যি বলছো? আমি তো কাল রাতে স্বপ্নে রামধনুর সিঁড়ি দেখেছি— বুবুন বিস্ময়ে বলে উঠলো।

হ্যাঁ, রামধনুর সিঁড়িই বটে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আকাশটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু সাহস হলো না। ঠাণ্ডায় তখন আমি প্রায় জমে গেছি। নিচে নামতে নামতে হঠাৎ দেখি অনেক নিচে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল ছোট বলের মতো কি যেন সব ঝুলছে। বুঝতে পারলাম না। কৌতূহল হলো। আরও নিচে নেমে এলাম। দেখি ওগুলো লাল বল নয়, পাকা আপেল থোকে থোকে ঝুলে রয়েছে। আমার ভীষণ আনন্দ হলো।

সবাই আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, 'বাঃ, আপেল! অত আপেল! বারে কি মজা! কি মজা! রোজি ব্ল্যাকি তো হাতে তালি দিয়ে উঠলো। গাং-শালিক তো নাচতে নাচতে এক পাক ঘুরেই নিল। খয়েরি মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে উঠলো, আহা আপেল ফুলে তাহলে অনেক মধু আছে তাই না লালমোহন? কিন্তু সে যে বড্ড দূর!

আমার যে বড্ড যেতে ইচ্ছে করছে লালমোহন। আমার যে পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। ঝরনা দেখতে ইচ্ছে করছে। নুড়ি পাথরের গান শুনতে ইচ্ছে করছে। আপেল বন দেখতে আর রামধনুর সিঁড়ি দিয়ে সেই কাচের ঘরে ঘুমন্ত আকাশপরীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে লালমোহন। আমাকে নিয়ে যাবে লালমোহন? কিন্তু আমি যাবো কি করে? আমার যে পা নেই। আমি যে

হাঁটতে পারি না। বুবুন এতক্ষণ বুকের মধ্যে যেন মেঘ ভরে রেখেছিল। এবার তাই বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়লো ওর দু'চোখ বেয়ে।

লালমোহনের চোখেও জল এসে গেছিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সবার দিকে তাকিয়ে দেখলো সবাই-ই চোখ মুছছে। আসলে বুবুনের এই দুঃখ কেউ সইতে পারে না। কেউ না। বুবুনের কষ্টে সকলেই তাই বড় কষ্ট পায়। চোখ মুছে লালমোহন বলে উঠলো, পারবে বুবুন, পারবে। তুমিও পাহাড়ে যেতে পারবে। ঝরনার গান শুনতে পারবে। ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচ দেখতে পারবে। সেই কথাই তো বলবো এখন। কিন্তু রামধনুর সিঁড়ির শেষে কাচের ঘরের ঘুমন্ত আকাশপরীর কথা তুমি জানলে কি করে বুবুন ভাই? অবাক গলায় বললো লালমোহন।

বারে! বললাম না, আমি যে কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি।

সত্যিই? স্বপ্নে তুমি দেখেছ এই সব? আর কি দেখেছ! সন্ন্যাসীকেও দেখেছ?

না, টুনটুনির ডাকে তো আমার ঘুমটাই ভেঙে গেল।

ও আচ্ছা। তবে শোন। আপেলের বন দেখে এত আনন্দ হলো যে আমি আপেল খাবার কথা ভুলেই গেলাম। শুধু এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে উড়ে যাচ্ছি। আপেলের গন্ধ শুঁকছি, দু'চোখ ভরে ওদের রূপ দেখছি, কিন্তু ছিঁড়তে ভীষণ মায়া হলো।

সবুজ টিয়া ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললো, বোকা! তুমি একদম বোকা, আপেল পেয়ে কেউ আবার শুধু শুধু গন্ধ শোঁকে, চেহারা দেখে! তুমি একেবারে আস্ত বোকা। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা আর একবার চেটে নেয় টিয়া।

চুপ কর সবাই! এখন কোনো কথা বলবে না। লালমোহন বললো।

আবার সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, চুপ। সবাই চুপ কর।

লালমোহন গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে বললো, এমন করে এগাছে ওগাছে উড়তে উড়তে হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখতে পেলাম।

গুহা, গুহা কী? গিরগিটি বলে উঠলো।

নাঃ, আর আমি কিছু বলবো না তোমাদের। রাগ করে লালমোহন লাল গলা ফুলিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলো।

বুবুন আবার কেঁদে ফেললো, না লালমোহন, তুমি থেমো না। তুমি আমাকে আকাশপরীর গল্প বল।

লালমোহনের রাগ জল হয়ে গেল। আহা বেচারি বুবুন।

গুহা হলো পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গর্ত। তাতে ছোট বড় জন্তু-জানোয়াররা যেমন থাকে তেমনি মানুষও থাকে। সন্ন্যাসী মানুষ।

তাই বুঝি? সন্ন্যাসী মানুষ থাকে? তারপর? অতর্কিতে টুনটুনির মুখ থেকে কথাগুলো ফোড়নের মতো বেরিয়ে পড়তেই সে ভয়ে ভয়ে লালমোহনের দিকে তাকালো।

বুবুনের বেদনামাখা মুখের দিকে তাকিয়ে লালমোহন টুনটুনির ওপর রাগ করতে পারল না। সে বলতে লাগল, সামনে ধুনি জ্বালিয়ে বসে ছিল সন্ন্যাসী। অত শীতেও গায়ে তার জামা নেই, কাপড় নেই, শুধু একফালি কৌপিন পরে আছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুর। মাথাভর্তি লম্বা লম্বা জটা।

তোমার ভয় লাগলো না সন্ন্যাসীকে দেখে? খরগোশ বুবুনের গা ঘেঁষে ভয় ভয় চোখ নিয়ে ঢোক গিলে বললো।

না, ভয় করবে কেন? সন্ন্যাসী ভারি ভাল। আমাকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিল। চোখাচোখি হতেই হাতের ইশারায় আমায় কাছে ডাকলে।

ওমা তাই? তুমি কাছে গেলে? প্রজাপতি লালমোহনের ডানায় এসে বসে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ, গেলামই তো! সন্ন্যাসী কাছে বসিয়ে আমাকে কত কি জিজ্ঞেস করলো। আমি কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, আমার কে কে আছে।

তুমি বললে? আমাদের সবার কথা বললে? ব্ল্যাকি কৌতূহলে টানটান হয়ে বসে লেজ নাড়াতে নাড়াতে প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, সবার কথা।

আমার কথা? আমার কথাও বললে? বুবুন শুধলো।

হ্যাঁ, বললামই তো! তোমার কথাই তো সবচেয়ে বেশি বললাম। তোমার দুঃখের কথা, তোমার জন্য আমাদের সবার দুঃখের কথা সন্ন্যাসীকে বললাম। তাই না শুনে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর পাশের একটা বড় পাথর সরিয়ে একটা ছোট গর্ত থেকে কতকগুলো গাছের শেকড় বের করে ধুনির আগুনের আলোর সামনে ধরে একটা মোটা মতো শেকড় বেছে নিল। আমাকে বললো, শোন, বরফের গায়ে রামধনুর সিঁড়ি দেখেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ দেখেছি।

কতটা উঁচুতে উঠেছিলে?

বেশি উঁচুতে উঠতে পারিনি, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি জমে যাব। তাই নিচে নেমে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, কেউ পারে না। অত উঁচুতে কেউ উঠতে পারে না। যাহোক ওখানেই সিঁড়ির শেষ ধাপে আছে একটা কাচের ঘর। সেই কাচের ঘরে থাকে আকাশপরী। প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে আকাশপরী কাচের ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। আকাশে উড়তে উড়তে ক্রমশ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলবে বলে। কিন্তু যখনই কোনো ছোট শিশুর কোনো দুঃখ দেখে, কষ্ট দেখে, তখনই আকাশপরীর দু'চোখ ছাপিয়ে জল নামে। পৃথিবীর মাটি থেকে সে আবার আকাশে উড়ে আসে। তার চোখের জল ঝরে পড়ে এই পাহাড়ের বুকে। আমি প্রতি পূর্ণিমার রাতে আকাশপরীর সেই চোখের জল এই কমণ্ডলুতে ধরে রাখি। এই শেকড়টা আকাশপরীর চোখের জল দিয়ে ঘষে তোমাকে একটা মলম করে দিচ্ছি। সামনের অমাবস্যার রাত পেরোলেই আসবে শুক্লা প্রতিপদ তিথি। এই শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন বুবুনের পায়ে এই মলম লাগিয়ে

দিও, দেখবে বুবুন ভালো হয়ে গেছে, স্বাভাবিক হয়েছে। বুবুন আবার দাঁড়াবে, হাঁটবে, ছুটবে। অনেক অনেক দূরে ছুটবে, পাহাড়ে উঠবে।

এতক্ষণ সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। এবার লক্ষ্য করলো বুবুন ওর শুকনো পাঁকাটির মতো পায়ে আপনমনে হাত বুলোচ্ছে। হাঁটুতে মুখ রেখে পাটাকে চুমো খাচ্ছে। ওর চোখের জলে পায়ের পাতা একেবারে ভিজে গেছে।

রোজি কুঁইকুঁই করে এগিয়ে এল। জিভ দিয়ে ওর চোখের জলটা চেটে দিল। সবাই বুবুনের আরও কাছে সরে এল।

লালমোহন কাউকে কিছু না বলে বকুল গাছে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই মুখে করে একখটা ঠোঙা নিয়ে এল। পাহাড়ি গাছের বড় পাতার তৈরি একটা মোড়ক। তার ভেতর থেকে একটা সুগন্ধি বেরিয়ে আসছে। লালমোহন বললো, এই যে মলম। কাল অমাবস্যা। পরশু পড়বে সেই শুক্লা প্রতিপদ তিথি। পরশু থেকেই আমরা বুবুনের পায়ে এই মলমটা লাগিয়ে দেব। কিন্তু একটা কথা।

কি কি? সমস্বরে সবাই বলে উঠলো।

এখন আমরা ছাড়া একথা আর কেউ জানবে না কিন্তু, এমন কি বুবুনের মা-ও না। পূর্ণিমায় বুবুন একদম সেরে গেলেই ওর মা সব জানবে, কেমন? সবাই রাজী তো?

রাজী রাজী রাজী। সবাই হাততালি দিয়ে গেয়ে ববুনকে ঘিরে নাচতে লাগলো

বুবুন সোনা ছুটবে এবার
চড়বে পাহাড় চূড়ে
জগতটাকে দেখবে এবার
নিজের পায়েই ঘুরে।

ওদের আনন্দে বুবুনও হাসে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে ওর। বুবুন শুধুই হাসে।

প্রতিদিনের মতো আজও সকালে কোলে করেই বুবুনের মা বুবুনকে চাঁপা গাছের তলায় বসিয়ে দিয়ে গেছিল। অন্যদিনের মতো রোজি ব্ল্যাকিও সঙ্গে ছিল। রোজি ব্ল্যাকির চোখে মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি। বুবুনের মা তেমন খেয়াল করেনি। সকালে বুবুনকে বসিয়ে দিয়েই এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি বুবুনের মা! আজ পূর্ণিমা। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। বাড়িতে পুজো আছে। কত কত কাজ বাকি। কাজ করতে করতে আজ আর খেয়ালই ছিল না বুবুনের কথা। বেলা বেশ হয়েছে। রোদের তাতটাও বেড়েছে। ছি ছি! ছেলেটা এতক্ষণ গাছের তলায় বসে আছে। না, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। হাতের কাজ ফেলে এক দৌড়ে বাগানে ছুটে এল বুবুনের মা। কি আশ্চর্য! বুবুন কই? বুবুন! চাঁপা গাছের তলায় বুবুন নেই তো! বুবুন...বুবুন...! বুবুনের মায়ের ডাক গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কি অদ্ভুত ব্যাপার। রোজি ব্ল্যাকিটাও যে কোথায় গেল! আবার ডাকলো, বুবুন.....বু...বু...ন...

না কোনো সাড়া নেই। কোনো পশুপাখিও তো দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার! বুবুন...বুবুন সোনামণি... ক্রমশ কেমন একটা ভয় চেপে ধরছে বুবুনের মাকে। গলাটা কাঁপছে। চোখের পাতা ভিজে উঠছে। প্রাণপণে আবার ডাকলো, বুবুন.....বু-বু-ন...

কান্নায় ভেঙে পড়ে বুবুনের মা। দু'হাতে মুখ ঢেকে চাঁপাগাছের তলায় বসে পড়ে। হঠাৎ চোখে অল্প গরম দুটো নরম নরম হাতের স্পর্শ পেল মা। কেউ দু'হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরেছে। চমকে চোখে হাত দিতেই বুবুনের ছোট্ট হাত দু'টো চিনতে ভুল হয় না মায়ের।

দুষ্ট ছেলে, বলে বুবুনের হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই বুবুনের মা চমকে ওঠে। এ কি! বুবুন ছুটছে। চাঁপাগাছের বাঁধান চাতাল ঘিরে ছুটছে, হাসছে, হাততালি দিয়ে বলছে, এ মা ধরতে পারলে না। এ মা ধরতে পারলে না।

বুবুনের মা দেখে বাগানের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসছে ব্ল্যাকি-রোজি, টিয়া, গঙ্গাফড়িং, খরগোশ, গিরগিটি, গাং-শালিক, মাছরাঙা, টুনটুন, কোকিল, লালমোহন। কাঠবেড়ালী নেচে নেচে এক লাইন করে গাইছে আর তার সুরে সুর মিলিয়ে সবাই গাইছে—

আকাশপরীর চোখের জলে
শিকড় ঘষে ভাই
বুবুন সোনার পা হয়েছে
আনন্দে গান গাই।
শোন শোন সবাই শোন
আর কোনো নেই মানা
সাগর পাহাড় ডিঙিয়ে বুবুন
জিনবে বিশ্বখানা।

বুবুনের মা অবাক হয়ে ওদের গান শুনতে লাগলো। সব কথার মানে মা বুঝতে পারছে না। দু'চোখ ভরা জল আর মুখে হাসি নিয়ে মা বুবুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই বুবুন ছুটে এসে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের মুখে চুমো খায়। বুবুনকে বুকের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে বুবুনের মা।

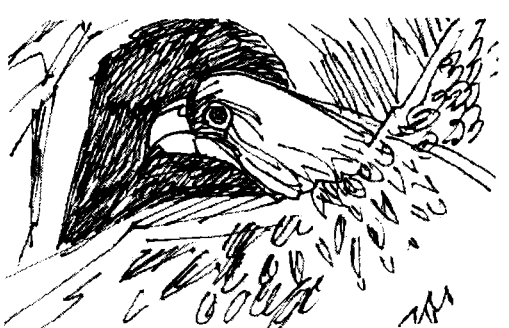

ছবি মদন সরকার

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাস্তায় লোক চলছে ঠিকই, তবে তারা সবাই স্ত্রীলোক। ক্বচিৎ কারও সঙ্গে একটা শিশু। বয়স্ক পুরুষ মাত্রই দু'টিকে দেখতে পাচ্ছে টারজান। তারা বল্লম হাতে করে বসে আছে বোঙ্গার মন্দিরের ঠিক সামনে। বোঙ্গার বিগ্রহ বলে যে পাথরখানার পূজা করে গাঁয়ের লোক, তার পিছনেই মন্দিরের অল্প খানিকটা জায়গা তালপাতার বেড়া দিয়ে আলাদা করে ঘেরা। সম্ভবত সেই ঘেরার ভিতরেই বন্দীকে বেঁধে রেখেছে।

গ্রামের বয়স্ক পুরুষেরা সম্ভবত জ্বালানি কাঠের সন্ধানে বেরিয়েছে ঐ দু'টো লোককে পাহারায় রেখে। তা ওদের উপস্থিতি এমন আর কী অসুবিধা ঘটাতে পারে টারজানের? থাকুক ওদের হাতে বল্লম। সে হাতিয়ার তো টারজানেরও আছে! উপরন্তু টারজানের আছে তীরধনুক। এইখানে বসেই দু'টো তীর খরচ করে সে তাদের বোঙ্গার দরবারে পাঠিয়ে দিতে পারে।

পারে দিতে, কিন্তু দিচ্ছে না। অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে টারজান। বন্দীকে উদ্ধার করার ব্যাপারে একটা লড়াই বেধে যাওয়া অনিবার্য। কিন্তু লড়াইটা অসার্থক না হয়, সেটা তো দেখতে হবে! গ্রামের লোক গ্রামে নেই আপাতত; কিন্তু বেশি দূরে তারা যায়নি। যাওয়ার দরকার কী? জঙ্গলে ঘেরা বস্তি, যেদিক দিয়ে ওদের খুশি জঙ্গলে ঢুকলেই কাঠ। এ অবস্থায় কেন যাবে তারা দূরে। বিশেষ যখন তড়িঘড়ি বস্তিতে ফেরার তাগিদ রয়েছে একটা! বৃহৎ ভোজ যেদিন হয়, নিছক উদরপূর্তির ভিতরে সেটা সীমাবদ্ধ রাখে না ওরা। সে উপলক্ষে নাচগান হয় দফায় দফায়। এরকম একটা অনুষ্ঠান করতে গেলে আগে থাকতে তার একটা প্রস্তুতি চাই না? নিশ্চয়ই চাই। এবং তা চাই বলেই বেলাবেলি ঘরে না ফিরে উপায় নেই জোয়ানদের।

এ সবই জানে টারজান। জানে যে সন্ধ্যার আগে কিছুই হবে না। এতক্ষণ তাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবেই। জোয়ানেরা গ্রামে নেই বলে যে এই ফাঁকে সে তার বন্দীকে উদ্ধার করে নিয়ে চম্পট দেবে, তার উপায় কই? চেষ্টা একটা করতে পারত, যদি নির্ভুল জানা থাকত যে বন্দীকে রাখা হয়েছে কোথায়। টারজানের অনুমান, সে ঐ বোঙ্গা-মন্দিরের ঘেরা অংশটাতে আছে। তা তো না থাকতেও পারে! থাকেও যদি, আছে হয়তো মাটির তলার কোনো সুড়ঙ্গে, যার ভেতরে নামবার কায়দাই ঠাউরে উঠতে পারবে না টারজান। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বোঙ্গার মন্দিরই দুর্গ হিসাবে ব্যবহার হয়, এ তো নিজের চোখেই ইতিপূর্বে সে দেখেছে।

না, আত্মপ্রত্যয় যত বেশিই থাকুক টারজানের, হঠকারী সে নয়। বোঙ্গার ঘরে আচমকা হানা দেওয়া তার পক্ষে সহজ,

কিন্তু হানা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় কোনোমতে, বন্দীকে উদ্ধার করার উপায় আর থাকবে না। সারা গ্রাম হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, নিজের নিরাপত্তার জন্যই পালাতে হবে টারজানকে। না, এমন কাজ টারজান করে না।

তবে কী করে টারজান এমন পরিস্থিতিতে?

করে অপেক্ষা। লুকিয়ে থাকার জায়গাটি তার ভালই জুটেছে। ধৈর্য ধরে বসে থাকা যাক। সন্ধ্যের আগে আর করার কিছু নেই। বস্তিবাসীরা আসুক, আগুন জ্বালুক, নাচে গানে মাতামাতি করুক, তার পরে ওরা ভোজে বসার জন্য তৈরি হবে। যেখানেই লুকিয়ে রেখে থাকুক তাদের বন্দীকে, বার করে এনে বেঁধে রাখবে একটা সদ্য-কেটে-আনা কাঁচা গাছের খোঁটার সঙ্গে। সেই সময় আসবে টারজানের কাজের সময়। তার আগে—

কিছু করবার নেই টারজানের। সে একটা ঘুমই বা দিয়ে নেবে না কেন ততক্ষণ? বাধা কী?

দেখতে দেখতে সত্যি সত্যি ঘুমিয়েই পড়ল টারজান। ঘুমের ঘোরে তার কানে যেন পৌঁছোতে লাগল একটা সিংহনাদের মতো গম্ভীর নির্ঘোষ। হারানিধির ডাক নয় তো? ঘুমোতে ঘুমোতেই টারজান হেসে ফেললো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে, কিছু হুঁশ নেই তার। হঠাৎই এক সময় ভেঙে গেল সে ঘুম। চোখ মেলে তাকাতেই দেখল, সারা গ্রাম আলোয় আলো। রাস্তায় লোক গিসগিস করছে, ঢাক বাজছে উচ্চরোলে, একটা সাহেবি পোশাকপরা মানুষকে খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে বোঙ্গার মন্দিরের সামনে।

ঈস! কী ঘুম! আর কিছুক্ষণ ঘুমোলেই তো জেগে উঠে দেখতে হতো যে যার উদ্ধারের জন্য সে সারাদিন বসে আছে গাছের ডালে, সে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে কালো রাক্ষসদের পেটে! ঈস্—

ধড়মড়িয়ে উঠতে গেল টারজান। আর সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল সেই ডালখানা, যার উপরে সারাদিন সে অঘোরে ঘুমিয়েছে।

এমন কাণ্ড টারজানের জীবনে কখনো হয়নি। অরণ্যশূন্য পথে বিচরণকালে সে লাফিয়ে লাফিয়ে এ-গাছ ও-গাছ করে থাকে। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরত্ব এক এক লাফে অতিক্রম করে মাটি থেকে একশো ফুট দেড়শো ফুট উঁচু দিয়ে। কোনো দিন হয় না দুর্ঘটনা। আজ কিন্তু হলো। মাত্রই পনেরো-ষোল ফুট উঁচু একখানা ডাল, সারাদিন টারজানের আড়াই মণ ওজন অক্লেশে বহন করার পরে, সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই জবাব দিল যে আর সে পারে না, তাকে অতঃপর রেহাই দেওয়া হোক এই কঠিন

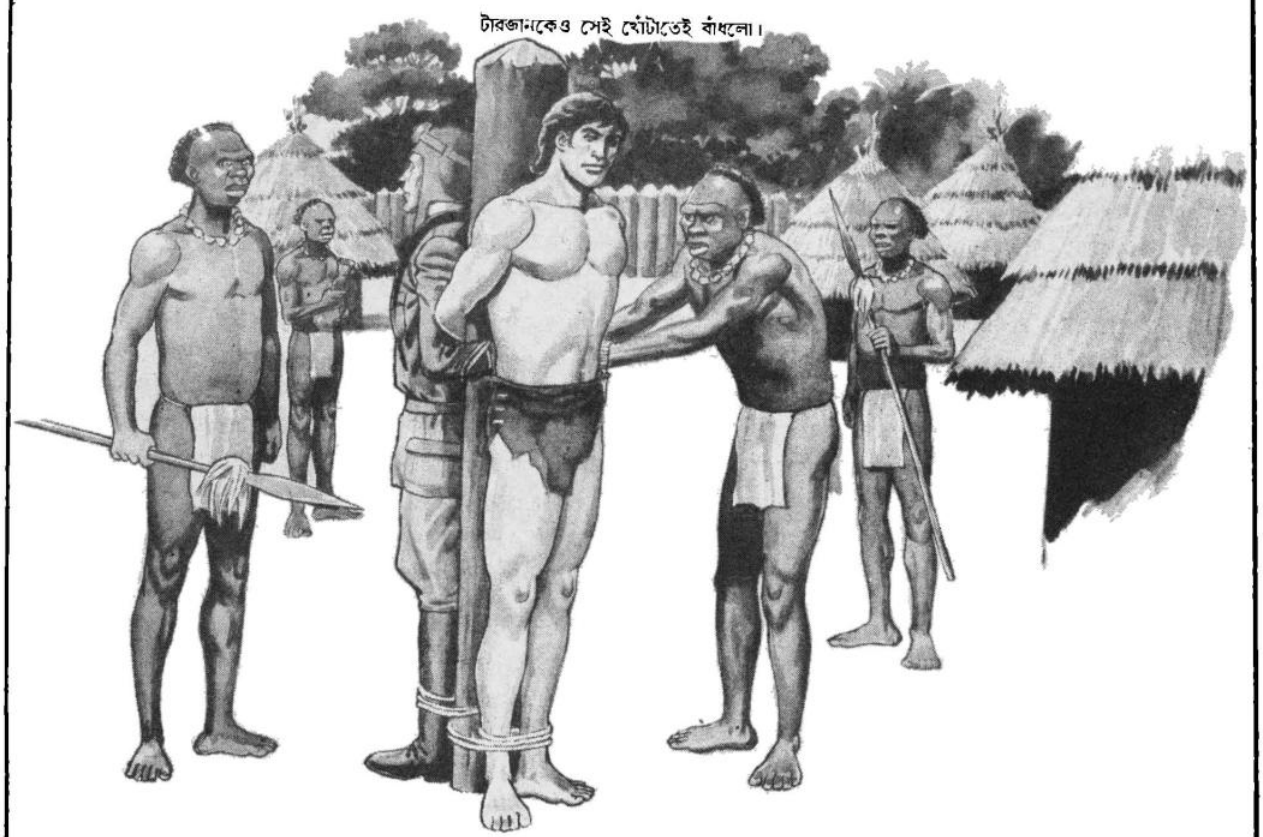

টারজানকেও সেই খোঁটাতেই বাঁধলো।

দায়িত্ব থেকে।

কী বিসদৃশ আচরণ এই গাছটার! সারাদিন রইল চুপ করে, যখন শোরগোল করলেও টারজানের ক্ষতি হতো না কিছু। বস্তিতে পুরুষ বলতে কেউ ছিল না। টারজান এক লাফে পিছনের অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। তা নয়, সারা দিন নীরবে বোঝা বয়ে এখন রাত্রিবেলা তার দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে বসল, ঠিক সেই সময়টা যখন এক বছর থেকে শুরু করে একশো এক বছর পর্যন্ত বয়সের প্রত্যেকটা বস্তিবাসী বোঙ্গা মন্দিরে হাজির, আমোদ-আহ্লাদ পানভোজনে রাত্রি যাপন করবার জন্য।

ডাল ভেঙে পড়তেই টারজানও মাটিতে পড়ল। এবং সব বস্তিবাসীও বোঙ্গাকে ছেড়ে এসে পড়ল ব্যাপারখানা দেখতে।

আরও একটা সাদা মানুষ! কোথা থেকে এল? কেন এল? কোনো জবাব দেয় না। দিলেও অবশ্য যাবে না বোঝা। আগের বন্দীটার উড়ে আসার একটা তাৎপর্য তবু যায় বোঝা। সে পাখি-যন্তরটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ার দরুন তাকে নেমে পড়তে হয়েছে এখানে। কিন্তু এই সাদাটা? তার কোনো যন্তর সঙ্গে নেই। তার আসার কারণ তাহলে কী হতে পারে?

যাহোক, কালোরা টারজানকে গাছতলায় ফেলে রাখেনি। হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় মাথায় চোট লেগেছিল একটু। ঝিমঝিম করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ। সেই সময়টুকুর মধ্যেই বস্তির যাবতীয় পুরুষ ছেঁকে ধরেছে তাকে। জনা দশ বারো কালো চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে টারজানকে। বোঙ্গা মন্দিরের সম্মুখে পোঁতা রয়েছে একটা খোঁটা। তাতে আগে থাকতেই বাঁধা আছে আগের বন্দীটা। এই দুই নম্বর লোকটার জন্য কি আর একটা খোঁটা পোঁতা হবে?

বস্তির সর্দার মাংরু মাতান, সে যেন এক কালোপাহাড় অবতার। টারজানের সমানই লম্বা, চওড়ায় টারজানের দেড় গুণ, গায়ে যে অসুরের শক্তি ধরে লোকটা, তা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সে হুঁকডাক করছে—'ঐ খোঁটারই উল্‌টো পিঠে বাঁধো এই নতুন লোকটাকে। এই রাত্রে এখন তো আর জঙ্গলে যাওয়া যায় না, আর একটা গাছ কেটে আনার জন্য। যে যাবে, তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। ন্যুমা আজ জেগেছে।'

ন্যুমা জেগেছে। মাংরু মাতানও শুনেছে তার হুঁক, শুনেছে টারজানও। মাংরু শুনেছে ভয়ে ভয়ে, টারজান শুনেছে সংশয়ে আশায়। কোনো দু'টো সিংহের গর্জন একেবারে হুবহু একরকম হয় না। ও বিদ্যায় বিশারদ যারা, তারা মন দিয়ে শুনলেই বেশ খানিকটা পার্থক্য ধরতে পারে দু'টো ন্যুমার হুঙ্কারে।

টারজানের প্রথম থেকেই সন্দেহ, হারানিধি তাকে অনুসরণ করে মরু পাহাড় পেরিয়ে এসেছে। মংরু সর্দারের ভাষা না বুঝলেও ঐ একই চিন্তা। বরং ওর চেয়েও একটু বেশি চিন্তা বারবার ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে তার মগজে। সে কাল রাত থেকেই মাঝে মাঝে শুনে আসছে একটা দূরাগত সিংহের গর্জন। এ গর্জন যে তার পড়ে পাওয়া বন্ধু হারানিধির, সে বিষয়ে টারজান এখন প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকবার সে তার সন্দিগ্ধ মনকে এই বলে চোখ রাঙিয়েছে, 'এ যদি আমার হারানিধির ডাক না হয়, তাহলে বৃথাই আমি ঘর করলাম ন্যুমা আর বোলগানির সঙ্গে?'

হ্যাঁ, সংশয়ের চাইতে আশাই ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিচ্ছে টারজানের মনে। ও যদি হারানিধি না হয়, আর হারানিধি হয়েও যদি ও টারজানের বিপদের কালে তার সাহায্যে অগ্রসর না হতে পারে, তাহলে তো খুবই সঙ্গীন অবস্থা দাঁড়াবে। কোন দেবতার রোষে তার আজ এই কল্পনাতীত সংকট, তা তাকে কে বলবে? মহাবনস্পতিদের তেতলা চারতলার ডালে ডালে লাফাতে সে চিরদিন অভ্যস্ত, সে একটা বারো ফুট উঁচু ডাল থেকে পড়ে যাওয়ার দরুন বেঘোরে প্রাণ হারাবে, সে যে একেবারেই একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

খোঁটা আগে থেকেই পোঁতা আছে, মাঝারি রকম মোটা-সোটা গাছের গুঁড়ি একটা, তার গা দিয়ে রস ঝরছে এখনো। এইরকম কাঁচা গাছই দরকার এ ব্যাপারে। খোঁটা যদি শুকনো হয়, তাতে আগুন ধরে যাবে তো! ধড়টা আধা-সিদ্ধ হওয়ার আগেই গাছটা ছাই হয়ে যায় যদি, ভোজের আনন্দ আদ্ধেক মাটি! সব জিনিসই কেতাদুরস্ত হওয়া চাই তো! বোঙ্গা যখন এই মাতান বস্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন মংরু সর্দারের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তস্য ঠাকুর্দাকে, তখন থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে ভোজের উৎসবের বিলকুল খুঁটিনাটি। আজ হঠাৎ তার হেরফের হলে বোঙ্গার রাগ হবে না? তখন ঠ্যালা সামলাবে কে? বোঙ্গা রেগে গেলে এক রাতে মড়কে উচ্ছন্ন যেতে পারে না মাতানের এই বস্তিটা?

খোঁটার এক পিঠে আগে থেকেই বাঁধা আছে একটা মানুষ। অন্য পিঠে নিয়ে টারজানকেও এবারে সেই খোঁটাতেই বাঁধলো। দড়িদড়ার বাঁধন নয়। সে তো ধাঁ করে পুড়ে যাবে। বাঁধন হলো মোটা লতার, সদ্য জঙ্গল থেকে কেটে আনা। কাঁচা খোঁটার মতো এরও গা থেকে রস বেরুচ্ছে। সহসা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, এমন ভয় নেই।

তা লতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলছে না কেন টারজান? এরকম প্রশ্ন যদি ওঠে, তার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, এই রাক্ষুসে হিঙ্গুনি লতা ঝলসানো যায়, পোড়ানো যায় না, কেটে ফেলা যায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে, ছেঁড়া যায় না আপ্রাণ চেষ্টাতেও। টারজান তা জানে। অবশ্য জানা সত্ত্বেও সে দুই-চারবার সে চেষ্টা করেছে, তাতে ফল হয়নি কিছু, উপরন্তু বিদ্রূপের অট্টহাসি শুনতে হয়েছে কালোদের দিক থেকে।

[চলবে]

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

তা ভালো থাকার কি জো আছে! উঃ, যা গরম! খুব কষ্ট হয় না? কিন্তু ভাবো দেখি একবার এই গরম না থাকলে ফল-টল পাকতো কি ভাবে! এই সময়টা তো ফলের মরশুম। কাঁঠাল গাছে আস্তে আস্তে পেকে উঠছে খাজা আর রসালো কাঁঠাল। বোশেখ মাসের মাতাল হাওয়ার দাপাদাপি সহ্য করে যে আমগুলো এখনো ঝুলছে সেগুলোয় এবার পাক ধরছে। এ ছাড়া লিচু আছে, জামরুল আছে, ফুটি আছে, তরমুজ তো আছেই। আর পাকা বেল অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তাই এখন শুধু মজা করে ফল খাওয়ার মরশুম। তোমরা তো জানোই, ফল শরীরের পক্ষে কতোটা উপকারী। তোমরা সময়ের ফল যে যতো পারো খেয়ো। তাই বলে কেউ যেন আবার হঠাৎ এক সঙ্গে একগাদা খেয়ে বসো না। পেটের অসুখ করবে তাহলে।

এবার যদি আমরা বাগানের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, এখনো বেল ফুল দু চারটে করে ফুটছে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বাঁদরলাঠি, গুলমোহর এখনো পথঘাট আলো করে আছে। গাছ-গাছালিরা অবশ্য এই সময় চাতকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। হাল্কা মেঘগুলো শুধু দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়। আবার এক একদিন দৈত্যের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দামাল হাওয়া। তার ঝাপটায় এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু। কেটে যায় গরমভাব। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শীতের আমেজ মনপ্রাণ জুড়িয়ে দেয়। এ সবই কিন্তু আসন্ন বর্ষার প্রস্তুতি। তোমাদেরও কাজ বাড়ে। যে সব গাছ পুঁতেছো তাতে জল দিতে হয়, গাছগুলোর যত্ন করতে হয়। মানুষের মতো গাছ-গাছালিরাও তো গরমে কষ্ট পায়। গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোর, দেখবে গাছও কেমন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

এই সময় বেলা যেন আর কাটতে চায় না। সূর্যদেব ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন পাঁচটা বাজার পঞ্চাশ সেকেণ্ড আগেই। সারাটা দিন আগুন ছড়াতে ছড়াতে তিনি পাটে বসেন ছটা বেজে ছ মিনিট ছ সেকেণ্ডে। অবশ্য রোদ্দুর পড়ে গেলে ফুরফুরে হাওয়ায় মন ভরে যায়। তাই না? এবার তোমাদের কয়েজনের চিঠির উত্তর দিই। তোমাদের অনেকেই তো ভীষণ অভিমান করে, দুঃখ পেয়ে চিঠি দিচ্ছো জবাব পাওনি বলে। কিন্তু দাদুমণির কি দোষ বলো? জায়গা এত কম যে মাত্র ক'জনেরই চিঠির জবাব দেওয়া যায়। জানি, তোমাদের খুব অসুবিধে হয়। কিন্তু কোনো উপায় তো নেই।

জয়িতা (বহরমপুর)

উত্তরঃ পুরো নাম ঠিকানা দাওনি কেন? শচীন কুইজ প্রতিযোগিতায় তুমি তাহলে আমার জন্যেই জিততে পারলে না? আমার খুব খারাপ লাগছে। যাই হোক, অমল মজুমদার সম্বন্ধে লেখা (ছবিসহ) খেলার পাতায় পাবে। আর শচীন সম্বন্ধে জানতে চেয়ে তুমি যে চিঠি দিয়েছিলে সেটা কিন্তু আমাদের হাতে আসেনি।

সুজিতকুমার বিশ্বাস (C/O প্রভুলাল সাউ, ২৬ পটারি রোড, মালিপাড়া, দুর্গামাঠ, কলকাতা-১৫)

উত্তরঃ দাদুমণির আগের আসল নাম কি? দাদুমণি তো দাদুমণিই। লেখা পাঠালে চিঠি পাঠানো যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যাবে।

রুবী রাই (C/O তীর্থ রাই, বেলতলা পার্ক, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর)

উত্তরঃ তোমার পুরো ঠিকানা তো ছেপে দেওয়া হলো। শুকতারার বন্ধুদের চিঠি নিশ্চয়ই পাবে। লেখা ভালো হলেই ছাপা হবে। তবে দেরি হবে কিন্তু।

কল্যাণ মহান্ত (C/O রঞ্জিতকুমার পোদ্দার', রায়গঞ্জ (টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে), উঃ দিনাজপুর)

উত্তরঃ এখন তো শুকতারায় ভূতের, গোয়েন্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বেশি করে ছাপা হচ্ছে। তুমি খেলার ওপর প্রশ্ন তোমাদের জিজ্ঞাসা বিভাগে পাঠিও।

প্রদীপ ভাদুড়ী (১৮০ সাহাড়া বি টি কলেজ, নিউব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগনা, ৭৪৩২৭৬)

উত্তরঃ তোমার গল্প কবিতা ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে। তোমার পুরো ঠিকানা তো ছেপে দেওয়া হলো। দেখো শুকতারার বন্ধুরা তোমায় চিঠি দেয় কিনা।

পৌলমী সরকার (জলপাইগুড়ি)

উত্তরঃ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। তুমি যদি একদিন আমাদের এখানে আসো তাহলে দেখতে পাবে রোজ কতো চিঠি, কতো লেখা, কতো ছবি আসে। আমাদের তো সবগুলোই পড়তে হয়। তাই তো মনে রাখা যায় না। তুমিই বলো তা কী সম্ভব? আমাদের দিকটা একটু ভাবো। তা ছাড়া, তুমিই বলো শুকতারার বন্ধুরা কেন অন্যের লেখা নিজের বলে পাঠাবে? সকলে বলেন, তাহলে আর দাদুমণি কি শিক্ষা দিচ্ছেন। আমায় কেমন লজ্জায় পড়তে হয় ভাবো একবার' যাই হোক, তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এইরকম চিঠিই কিন্তু আমি চাই।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

টুটু সামন্ত, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী, খান্দারা হাই স্কুল

আমার বাঘ দেখা

সেদিন ছিল রবিবার। বর্ষাকালের আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বৃষ্টি বাদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সন্ধ্যে ৭টা। সকালে মাসি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। মাসি থাকেন রেডব্যাঙ্ক বাগানে। মেসোমশাই সেখানে চাকরি করেন, ছুটির দিন হলেই মাসি আমাদের বাড়ি চলে আসতেন। আর চলে যাবার সময় আমি মাসির সঙ্গ নিতাম। মাসির মারুতি ভ্যানে আগেই গিয়ে উঠে বসে থাকতাম।

এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। আমি আর মাসি বাড়ি থেকে রওনা হলাম। বড় রাস্তা পার হয়ে, জঙ্গল পার হয়ে গেল, চারিদিকে শুধুই অন্ধকার। অনেক অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। দুই দিকে ঘন ঝোপঝাড়। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ। আমার তো গাড়িতেই চোখ বুজে আসছিল ঘুমে। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। ভাবলাম বাড়ি পৌঁছে গেছি। গাড়ির দরজা খুলে যেই নামতে যাব অমনি মাসি বলে উঠল, নামিস না, নামিস না, এখনো বাড়ি পৌঁছায়নি। দেখলাম গাড়ির ড্রাইভার কাচের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুস হ্যাস করছে, আর মাসিকে বলছে, মেমসাহেব এ কুত্তা যাতা হী নেহি। এমন সময় কুকুরটা উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখি, কি ভয়ঙ্কর! ওটা কুকুর নয় একটা বাঘ! আমার তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা। বাঘটা মিনিট পাঁচেক তাকিয়ে রইল, তার পর আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

এটা কিন্তু বানানো নয় সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা।

পৌলোমী সরকার, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
কেরানীপাড়া, জলপাইগুড়ি

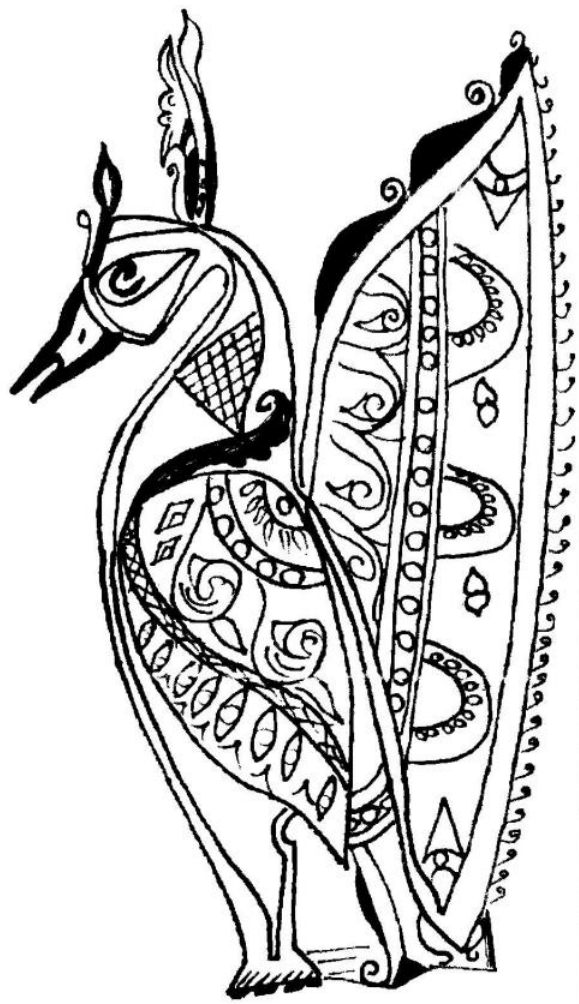

কৌশিক সিংহ, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, ধানবাদ

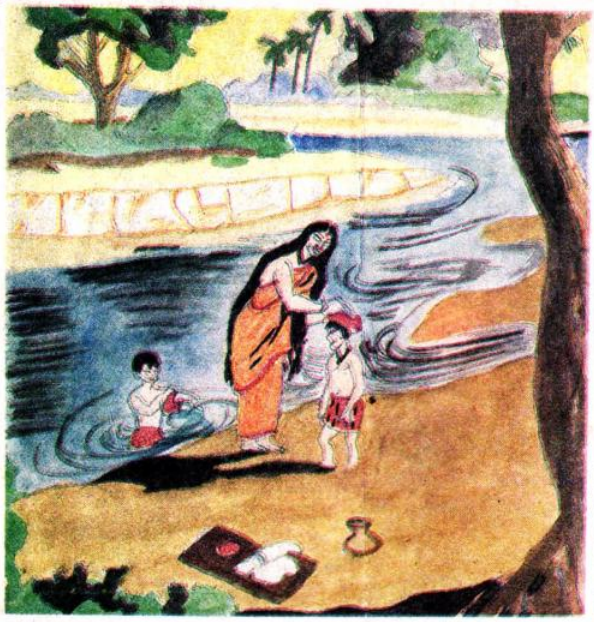

সুমিতেশ ভট্টাচার্য, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, নালীয়াপুল বঙ্গীয় বিদ্যালয়, ডিব্রুগড়, অসম

রোবো

যদি পোষ রোবো,
ওর কাছে জেনে নেবে
কি হবে তা বলে দেবে
সঙ্কেত দিও তাকে—ব্রাভো।

যদি পোষ রোবো,
র‍্যাশনেতে লাইন দেবে
কেরোসিনও এনে দেবে
তেল হাতে বলবে সে—খাবো।

পুষবে কি রোবো?
অঙ্কেতে হলে ভুল
ধরবেই চেপে চুল
চড় তুলে বলবে সে—দেবো!

কৌস্তভ দাশগুপ্ত,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যালয়, কাটিহার।

মিতালী রায়,
বয়স নয়, তৃতীয় শ্রেণী,
হোলি মিশন কে. জি. স্কুল, কোন্নগর, হুগলী

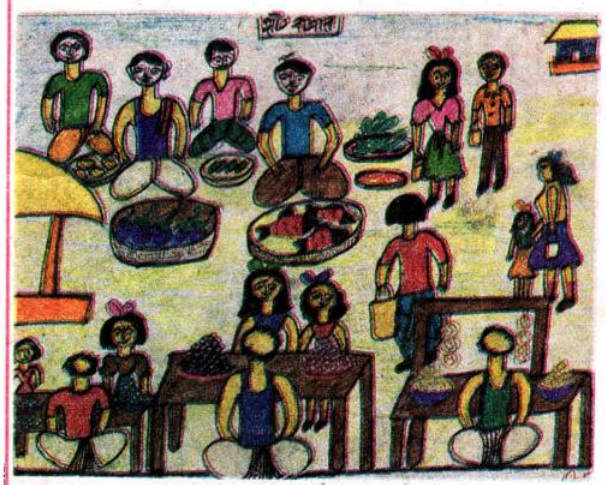

অংশুমিত্রা রায়, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, কার্লো বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান

কাকুর বিয়ে

কাকুর বিয়ে, কাকুর বিয়ে,
টোপর মাথায় দিয়ে।
দই মিষ্টি খাবো মোরা,
যত খুশি চেয়ে।
বরযাত্রী যাবো আমি,
ট্যাক্সি, বাসে চড়ে।
কাকীমাকে আনব আমি,
কত আদর করে।

সোমা সাঁতরা, বয়স সাত,
প্রথম শ্রেণী, বিষ্ণুপুর
শিশুমেলা বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

শতাব্দী চ্যাটার্জী, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী, ডি. নোবিলি স্কুল, মুগমা, ধানবাদ

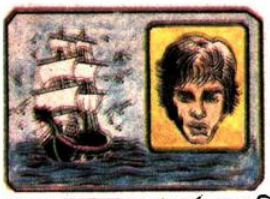

সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক অভিযান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

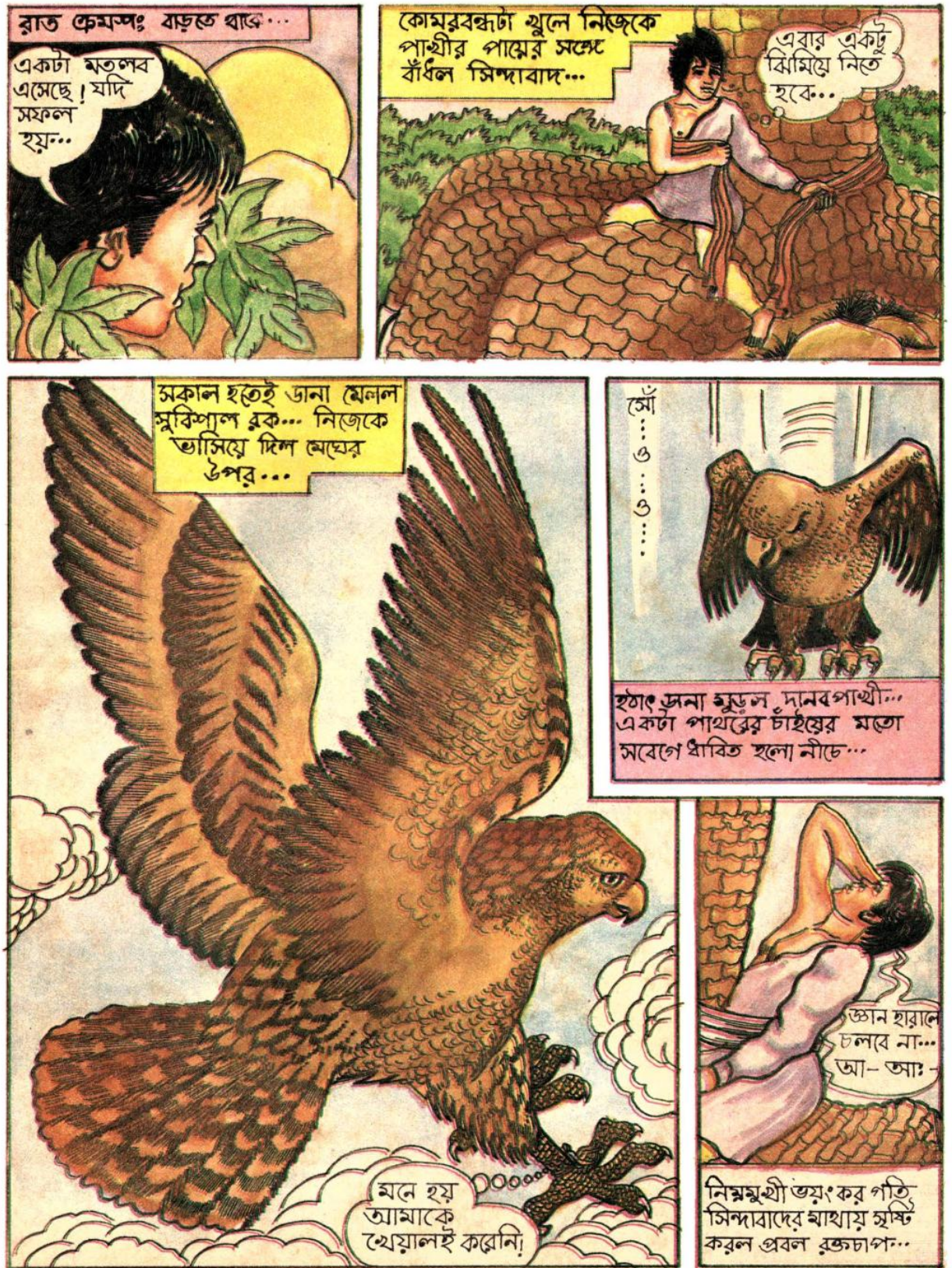

রাত ক্রমশঃ বাড়তে থাকে...
একটা মতলব এসেছে! যদি সফল হয়...
কোমরবন্ধটা খুলে নিজেকে পাখীর পায়ের সঙ্গে বাঁধল সিন্দাবাদ...
এবার একটু ঝিমিয়ে নিতে হবে...
সকাল হতেই ডানা মেলল সুবিশাল রক... নিজেকে ভাসিয়ে দিল মেঘের উপর...
মনে হয় আমাকে খেয়ালই করেনি!
সোঁ...ও...ও....
হঠাৎ ডানা মুড়ল দানবপাখী... একটা পাথরের চাঁইয়ের মতো সবেগে ধাবিত হলো নীচে...
জ্ঞান হারালে চলবে না... আ- আঃ -
নিম্নমুখী ভয়ংকর গতি সিন্দাবাদের মাথায় সৃষ্টি করল প্রবল রক্তচাপ...

[চলবে]

বিষাক্ত সাপের খোঁজ চলছে

শঙ্খচূড়

বিষে বিষক্ষয়

পথিক মণ্ডল

সাপের বিষ যেমন উপকারী তেমন ক্ষতিকর। সারা বিশ্বে প্রায় দু'হাজার চারশো রকমের সাপ বসবাস করে। এদের মধ্যে শতকরা আট ভাগের বিষ মারাত্মক। হাতিকে নিমেষে মেরে ফেলতে পারে এমন বিষধর সাপও রয়েছে এই প্রকৃতি-রাজ্যে।

সাপের মুখে থাকে লালা। শিকার দেখলেই এই লালা প্রচুর পরিমাণে ঝরতে থাকে। শিকারকে সহজে মুখগহ্বরে ঢোকাতে লালা বিশেষ সহায়তা করে। লালার সঙ্গে একপ্রকার হলুদ বস্তু নিঃসৃত হয়। বস্তুটি শিকারকে অবশ করে দেয়। এই বস্তুটিকেই বলা হয়ে থাকে সাপের বিষ।

কোবরা আর ভাইপার শ্রেণীভুক্ত সাপেরাই বেশি বিষধর। এদের মুখের উপরের চোয়ালের দুই পাশে দুটি বিষদাঁত থাকে। কাউকে পলকে ছোবল মারলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ শিকারের দেহে প্রবেশ করে। বিষে শিকারের স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়। অনেকসময় চলাফেরার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেতে পারে।

কোবরা শ্রেণীভুক্ত সাপদের মধ্যে গোখরো, কেউটে আর শঙ্খচূড় প্রধান। দক্ষিণ আমেরিকায় এক ধরনের কোবরা আছে যারা তাদের বিষদাঁত থেকে বিষ স্প্রে করে শিকার ধরে। এই বিষ আট ফুট দূরত্ব পর্যন্ত তারা ছিটোতে পারে। বিষে শিকারের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তাই মানুষ এদের কাছাকাছি আসে চোখে চশমা আর হাতে গ্লাভস্ পরে।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সাপ পৃথিবীতে এসেছে মানুষের

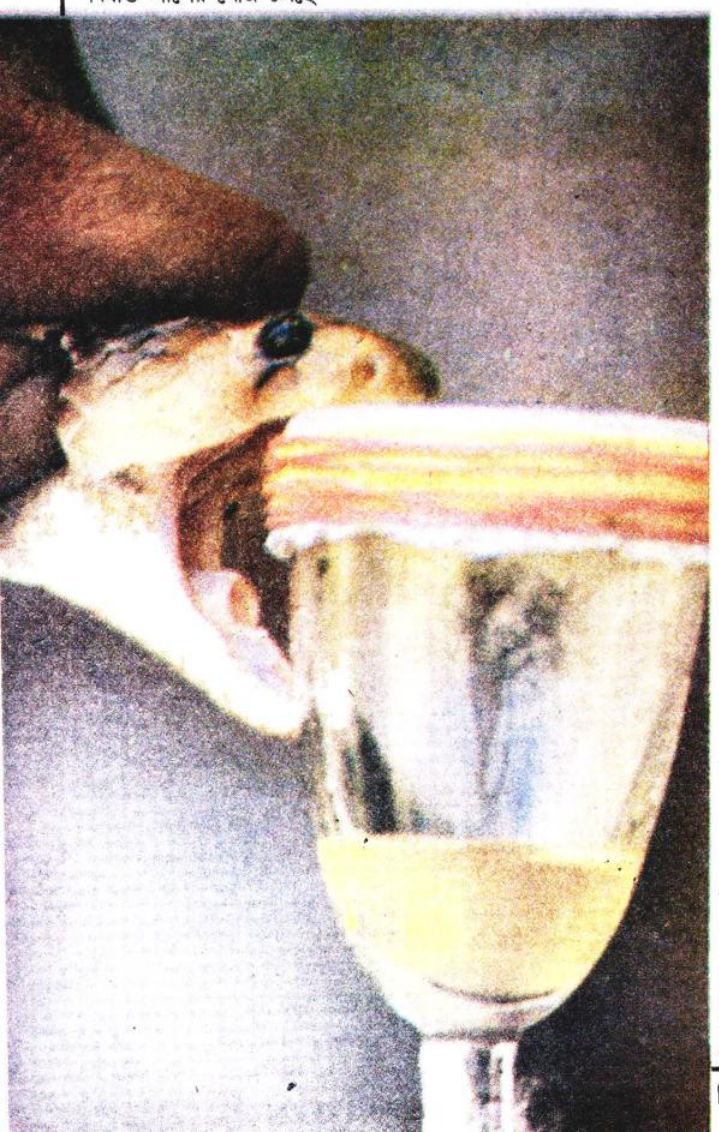

বিষদাঁত থেকে বিষ বের করা হচ্ছে

অনেক কোটি কোটি বছর আগে। কারুর মতে তখন এরা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করত। পরে কালের বিবর্তনে তাদের সেই পা লুপ্ত হয়ে যায়। পরিবর্তে তৈরি হয় নতুন অঙ্গ—বিষদাঁত। এসব নাকি বাঁচার তাগিদে পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে। আর এদের গায়ের যে তেলতেলে ভয়ঙ্কর রঙ তাও নাকি পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের আড়াল করার তাগিদে সৃষ্টি। এর ফলে তারা ভালভাবে বাঁচতে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

প্রতিবছর ভারতের নানা প্রান্তে অসংখ্য মানুষ মারাত্মক সব বিষধর সাপের ছোবলে মারা যায়। তাদের বিষ মানবশরীরে প্রবেশ করলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাপেকাটা রোগী বড্ড বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়েও মৃত্যু ঘটে।

সাপের বিষ থেকে তৈরি হয়েছে অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন। এর দ্বারা সাপে কাটা রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় 'ল্যাকোশিস্ আর্সেনিকাম' ওষুধটি সাপের বিষ থেকে প্রস্তুত করা হয়। এর ভেষজগুণ চমৎকার। এছাড়া সাপের বিষে তৈরি হয় নানাবিধ টনিক বা সিরাপ যা শরীরকে নানাভাবে চাঙ্গা রাখতে সহায়তা করে।

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামবাংলায় বিষধর সাপের উপদ্রব বাড়ে। তাই এই সময় মা মনসার পুজোর প্রচলন আছে। মানুষের মন থেকে ভয়ভীতিকে দূর করতেই এই পুজোর ব্যবস্থা। তবে সাপের বিষে যাতে মানুষের মৃত্যু আর না ঘটে তার জন্য বিজ্ঞানীরা নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাগারে পুরোদস্তর কাজ চলছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বিশ্বে মোট ৩৭,০০০ জাতের সাপের মধ্যে ২৮০টি বিষাক্ত। ভারতে ৬৮টি জাতের সাপ

বিষ থেকে তৈরি অ্যান্টিভেনাম

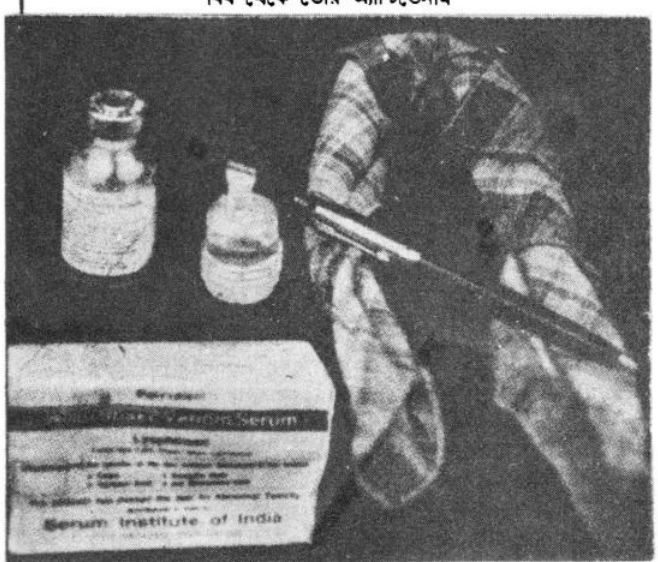

বিষাক্ত সাপকে ধরার চেষ্টা

কেবলমাত্র বিষাক্ত। এদের মধ্যে সামুদ্রিক সাপের সংখ্যা ৩০। তবে জলের সাপের বিষে মানুষ চট করে মরে না। ডাঙার সাপেই বিষ বেশি। তাদের বিষেই মৃত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক।

সাপের রাজ্যে গোখরো সাপের বিষই মারাত্মক বিষাক্ত। এই বিষ বিভিন্ন ধরনের রক্তে মিশে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দুষ্প্রাপ্য গ্রুপের রক্তে বিষের প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। অনেক সময় প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। দেরি হলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গোখরোর বিষ থেকেই অ্যান্টিভেনম ওষুধ তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে বোম্বের হফ্‌কিন্ ইন্সটিটিউটে।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। উগ্র বিষধর সাপের বিষ নিয়ে তাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখেছেন অন্য বিষধর সাপে কাটলে সেই উগ্র বিষ দিয়েই তার চিকিৎসা করা দরকার। এই 'বিষে বিষে বিষক্ষয়' করতে পারলে রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বিষধর সাপের রক্তে এমন এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে যা অন্য সাপের বিষকে নির্মূল করতে সাহায্য করে। তাই উগ্র বিষধর সাপের বিষই এক্ষেত্রে বেশি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে বিষধর সাপেদের মধ্যে গোখরোর বিষে 'নিউরোটক্সিন' থাকে। পদার্থটি মানুষের বা কোনো পশুর শরীরে প্রবেশ করলে হাত পা সব অসাড় হয়ে পড়ে। ৫০ মিনিটের মধ্যে রোগীর মুখ থেকে ফেনা বের হতে থাকে। অনেক সময় বমি বমি ভাব হয়। বমিও হতে পারে। জিভে জড়তা দেখা দেয়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে রোগীর দেহ প্যারালাইজড হয়ে যায়। শেষে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়। এই কারণে সবসময় বিষধর সাপের থেকে দূরে থাকাই ভাল। সাপ নিরীহ প্রাণী ঠিকই, কিন্তু তার থেকে সর্বদা তফাতে থাকা বা তাদের এড়িয়ে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ ও শ্রেয়।

মিনুর জেঠু

রণেন বসু

আজকের গল্পটাকে গল্প না বলে কাহিনী বলাই উচিত। কারণ, ঘটনাটি সত্যি আর তার সাক্ষী আমি নিজে। দীর্ঘ তিরিশ বছর বাদে সে কথা ভাবলেও আমার মনে বিস্ময় জাগে, শরীর শিউরে ওঠে।

তখন আমার বয়েস মাত্র ষোল, সামান্য দুই এক মাস এদিক ওদিক হতে পারে। সবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হাতে লম্বা ছুটি। কী ভাবে ছুটিটা উপভোগ করবো ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় উত্তরবঙ্গ থেকে আমার পিসেমশাই কলকাতায় এলেন কী এক কাজে। ফেরার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

পিসেমশাই ছিলেন রেলের ভ্রাম্যমান টিকিট পরীক্ষক। তাঁর কর্মস্থল ছিল নিউমাল জংশন-চ্যাংড়াবান্ধা শাখা লাইনের দোমহানী স্টেশনে। স্টেশনের কাছেই কোয়ার্টার্স। পিসেমশাই প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'কী ছিল আর কী হয়েছে!'

পূর্বে নাকি, পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়ে এই লাইনটাই মেইন লাইন ছিল। আসামগামী মেল এক্সপ্রেস হরদম এখান দিয়ে চলাফেরা করতো। আর তখন দোমহানী ছিল ঐ লাইনের প্রধান কার্যালয়। স্টেশনও ছিল জমজমে। পরে পাকিস্তান হওয়ায় সীমান্ত বন্ধ হয়ে লাইনের গুরুত্ব কমে গিয়ে শাখা লাইনে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে দোমহানীরও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

স্টেশন ছোট হলেও পুরনো রেল কলোনি কিন্তু বিশাল। তিস্তা নদীর তীরে হাট, গঞ্জ ও কলোনি নিয়ে বেশ জমজমে লোকালয়। সাহেবদের তৈরি রেল কলোনি সাহেবী ধরনেরই সাজানো গোছানো। মোড়াম বিছানো নিচু প্ল্যাটফর্মের গায়ে লাল স্টেশন বিল্ডিং। পুরো স্টেশনটা গাছ-গাছালিতে ঘেরা। কলোনির রাস্তার ধারে ধারে আম, কাঁঠাল ও লিচু গাছ। যার যেমন খুশি পাড়ছে। শহুরে মানুষ, কয়েকদিনের মধ্যেই গাছে ওঠা শিখে গেলাম। জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগে গেল। ভাল লাগার আর একটা কারণ আমার পিসতুতো বোন মিনু। আমার থেকে মাত্র কয়েক মাসের ছোট। সেও সেবার তাদের রেল স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল দিয়েছে। দু'জনের হাতেই পড়াহীন অফুরন্ত ছুটি।

স্টেশনের কাছেই হাট। সপ্তাহে দু'দিন বুধ আর রবিবারে হাট বসতো। হাটে ঘুরে ঘুরে দেখতাম। অন্যদিনে তিস্তার চরে বেড়াতে যেতাম। ধু-ধু তিস্তার চর। ওপারে হালকা বনরেখা, যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। কখনও রেললাইন ধরে হেঁটে চলে যেতাম স্থানীয় মন্দিরে। ওরা বলতো ধুমবাবার মন্দির। তবে সবচেয়ে মজা ছিল, ট্রেনে চেপে পাকিস্তান সীমান্তে চ্যাংড়াবান্ধায় যাওয়া বা নিউমাল জংশনে গিয়ে চা বাগানে ঘোরা। পিসেমশাই ভ্রাম্যমান টিকিট পরীক্ষক অতএব আমাদের টিকিট কাটার প্রশ্নই উঠতো না, উপরন্তু আমরা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করতাম।

সেদিন আমরা মালবাজার থেকে ফিরছিলাম। যথারীতি প্রথম শ্রেণীর কামরা। কামরায় আমরা দুজন মাত্র ছিলাম। মালবাজার ছাড়তেই দুই ধারে চা-বাগানের পর চা-বাগান। নেওরা নদী পেরোতেই শুরু হলো গভীর বন। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে গাড়ি ছুটে চলল। রাত সবে আটটা কিন্তু বনের মধ্যে ছুটন্ত গাড়ির নির্জন কামরায় বসে মনে হচ্ছিল গভীর রাত। রেললাইনের ওপর হাতির উৎপাত থাকে বলে ইঞ্জিন প্রচণ্ড সিটি দিতে দিতে চলছিল। হঠাৎ গাড়িটা একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মিনু জানালার শিকে গাল লাগিয়ে সামনে চেয়ে বলে, 'ইস্! আউটার সিগনালে দাঁড় করিয়ে দিল! কত দেরি হয়ে যাচ্ছে বল তো। বিয়ে বোধহয় শেষই হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ গিয়ে হয় তো কিছুই পাবো না!'

'তোর শুধু খাওয়ার চিন্তা!'

'আরে বিয়ে বাড়ি মানেই তো খাওয়া।'

আর তখনই আমাদের ভীষণ চমকে দিয়ে বন্ধ করা দরজার

ল্যাচ ঘুরে গেল আর দরজাটা সামান্য নড়ে উঠল। নির্জন বনের মধ্যে, ফাঁকা কামরায় আমরা মাত্র দু'জন, ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। সেই কারণেই মিনু দরজা দু'টো ভাল করে বন্ধ করে দিয়েছিল। এবার তা খুলে যেতেই সে সামান্য আর্তনাদ করে আমার দিকে সরে এল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেল, কারণ দরজা খুলে যিনি উঠলেন তিনি বয়স্ক আর মিনুর পরিচিত।

'জেঠু আপনি!'

'হ্যাঁ মা বিশেষ দরকারে তোমার জন্যই এই কামরায় উঠলাম। তুমি তো জানো আজ রাতে তোমার সোনালীদির বিয়ে।'

'জানি মানে! সেইজন্যেই তো ভীষণ ছটফট করছি। ইস্ কী দেরি হয়ে গেল! আগের গাড়িটা ফেল করেই সব গোলমাল হয়ে গেল। গিয়ে হয়তো সোনালীদির বিয়েটাই দেখতে পাবো না। কী খারাপটাই না লাগছে।'

'পারবে, ন'টায় লগ্ন, এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে। তার আগেই গাড়ি দোমহানী পৌঁছে যাবে।'

'যাক তাহলে বিয়ে দেখতে পাবো! কিন্তু জেঠু আপনার মেয়ের বিয়ে অথচ এখনও বাড়ি যাননি! কখন যাবেন আর কখনই বা বিয়ে দেবেন!'

'আমি তো যেতে পারবো না।'

'সেকি! যেতে পারবেন না মানে! মেয়ের বিয়েতে থাকবেন না! এই তো সামনেই নাটাগুড়ি স্টেশন তার পরেই দোমহানী। আপনিই তো বললেন, ন'টায় লগ্ন, তার আগেই গাড়ি পৌঁছে যাবে। তবে উপস্থিত থাকতে পারবেন না কেন?'

'বিশেষ কাজ আছে, আমাকে এক্ষুণি নাগরাকাটায় ফিরে যেতে হবে।'

'কী এমন কাজ যাতে মেয়ের বিয়েতে থাকতে পারবেন না। না না, যেতে হবে না। চলুন, বিয়ের পরেও যেতে পারবেন।'

'না মিনু, আজ কিছুতেই বিয়েতে থাকতে পারবো না। আমাকে এখুনই নাগরাকাটায় ফিরে যেতে হবে। না গেলেই নয়। অথচ এই দু'হাজার টাকার জন্যে আটকে আছি। তাই তো তোমার কাছে এসেছি। বিয়ের আগেই টাকাটা না নিয়ে যেতে পারলে, বিয়েটা হয়তো আটকে যাবে। পণের টাকা, বিয়ের আগেই পাত্রের বাবার হাতে তুলে না দিলে অনর্থ হয়ে যেতে পারে। আমি তো যেতে পারছি না, তুমি মা টাকাটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও।' শেষের দিকে ভদ্রলোকের গলা ধরে এলো। সেটাই

'কি অদ্ভুত কথা!'

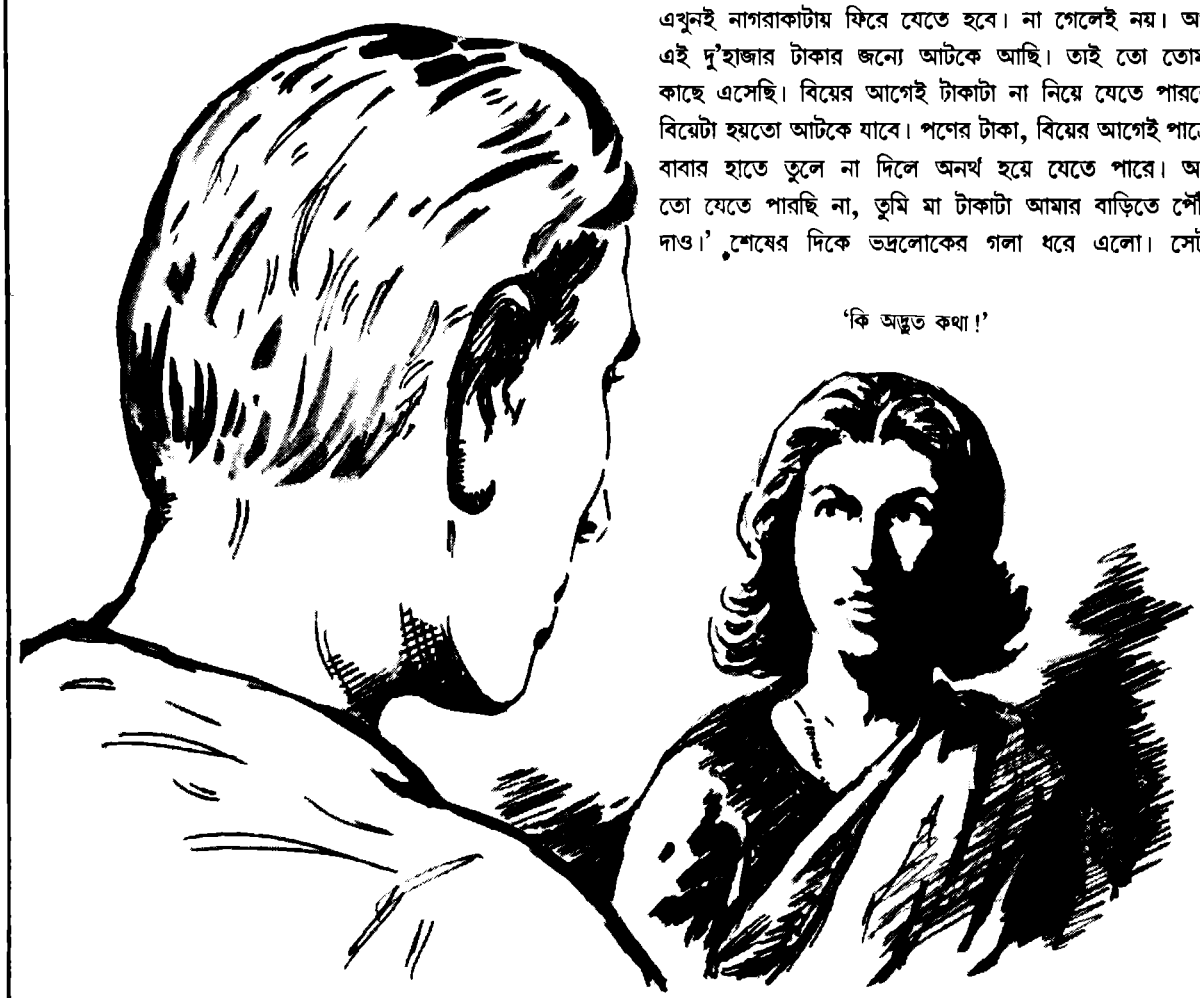

স্বাভাবিক, মেয়ের বিয়ে অথচ যে কোনো কারণেই হোক, যেতে পারছেন না।

'সে না হয় আমি দেব, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে আপনি থাকবেন না যদি....'

মিনুর কথা শেষ করতে দিলেন না তিনি, 'আমি না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না। সোনালীর জেঠা কাকারা সব আছেন। তাছাড়া তোমার জেঠিমাকে তো জান, ঠিক ম্যানেজ করে দেবে। এই টাকাটার জন্যেই বেরিয়েছিলাম।' টাকাগুলো মিনুর হাতে দিতে দিতে বলে চললেন, 'নাগরাকাটার একজনের কাছে পাওনা ছিল। সকালেই দেবার কথা ছিল, কিন্তু চেষ্টা করেও সকালে দিতে পারেনি, সন্ধ্যের একটু আগে দিতে পারলো। টাকাটা নিয়ে ছুটে এসেছি যদি কারোর হাতে পাঠাতে পারি। তোমাকে পেয়ে গেলাম।'

মিনু টাকাগুলো তার হাত ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে আমার দিকে তাকালো। ভদ্রলোকও আমার দিকে তাকালেন। 'তুমি মা ব্যাগটা সাবধানে রেখো। আর স্টেশনে নেমেই বাড়ি যেও না। বুঝতে পারছো অনেক দেরি হয়ে গেছে। সোজা গান্ধী কলোনিতে আমার বাসায় চলে যেও।'

'ও নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না, কিন্তু আপনি এখন নাগরাকাটায় ফিরবেন কী করে?'

'নাটাগুড়ি থেকে লরি বা বাসে চলে যাবো।' একটু থেমে কি যেন ভাবলেন। ততক্ষণে সিটি দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ডান দিকে একটা বড় কাঠ চেরাই মিল রেখে গাড়ি স্টেশনে ঢুকছে। ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে হাতলে হাত রেখে বললেন, 'সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে, এই আমার শেষ কাজ, অথচ এমন কাজ পড়ে গেল।' বলতে বলতে তিনি দরজা খুলে নিচে নেমে গেলেন। সেই মুহূর্তে নাটাগুড়ি ছেড়ে আবার গাড়ি চলতে শুরু করলো।

ঠিক সময়ই ট্রেনটা দোমহানীতে পৌঁছে গেল। আমরাও বাড়ি না ফিরে গান্ধী কলোনিতে গিয়ে সোনালীদির মার হাতে টাকাগুলো তুলে দিলাম। দিলাম মানে মিনু দিল। ওঁরাও টাকার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বোধহয় বিয়েও পিছিয়ে যাচ্ছিল সেজন্য।

যাহোক আমাদের পক্ষে বাসায় ফিরে এসে জামা-কাপড় বদল করা আর সম্ভব ছিল না। তাছাড়া পিসেমশাই পিসিমা বিয়ে-বাড়িতে চলে এসেছেন। আমরা বিয়ের আসরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই কন্যা সম্প্রদান শুরু হলো।

বিয়ে দেখে খাওয়াদাওয়া করে রাতে সবাই ফিরে এলাম নিজেদের বাসায়।

গভীর রাতে পিসিমার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে দেখি, মিনুও তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বারান্দায় অনেকেই বসে বা দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সোনালীদির জেঠা ও কাকাকে চিনতে পারলাম। তাঁদের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো। বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁরা বিধ্বস্ত। কিন্তু বিয়ের রাতে কী এমন ঘটেছে যাতে এঁরা পাগলের মতো ছুটে এসেছেন?

মিনুর দিকে ফিরে পিসেমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিনু, তুমি কি তোমার জেঠু মানে সোনালীর বাবাকে সত্যিই দেখেছো?'

প্রশ্নটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো।

'বারে, না দেখলে টাকাগুলো পেলাম কী করে!' তার গলায়ও বিস্ময়।

'না, মানে,' পিসেমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, 'অন্য কেউ তো দিতে পারে। হয়তো তুমি ঠিক বুঝতে পারনি।'

'কী অদ্ভুত কথা! জেঠুকে আমি চিনবো না! অন্য কাউকে জেঠু বলে ভুল করবো!'

'তুমি কি সত্যিই আটটার সময় নাটাগুড়ি স্টেশনে জেঠুকে দেখেছো?'

'জেঠুকে নয় তো আর কাকে দেখবো!' তার গলায় জেদের সুর।

আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ সোনালীদির বাবাকে আমি আগে চিনতাম না, সেই প্রথম দেখি, তাই বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকি।

'তুমি বলছো, আটটার পর নাটাগুড়ি স্টেশনে জেঠু নিজে হাতে তোমাকে টাকা দিয়েছেন অথচ একটু আগে স্টেশনে টেলিগ্রাম এসেছে, সন্ধ্যা নাগাদ নাগরাকাটা স্টেশনের কাছে লাইনে কাটা পড়ে তিনি মারা গেছেন।'

'অসম্ভব! জেঠু কাটা পড়তেই পারেন না। তিনি নিজের হাতে আমাকে টাকা দিয়েছেন। যে কাটা পড়েছে সে অন্য লোক।'

'তোমার জেঠুকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানিয়েছেন। এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি লাইন পার হচ্ছিলেন। এমন সময় একটা ট্রেন এসে পড়লে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু তাঁর কাছে টাকাগুলো পাওয়া যায়নি। অথচ তুমি বলছো...' পিসেমশাই আর কথা শেষ করতে পারলেন না।

'না না, এ হতেই পারে না। জেঠু নিজের হাতে....' বলতে বলতে মিনু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে মেঝেতে বসে পড়ে।

স্নেহ-ভালবাসার কি শক্তি আজও তা ভাবলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। মৃত্যুও তাকে পারে না শিথিল করতে।

মিনুর জেঠু জানতেন টাকাটা ঠিক সময়ে না পৌঁছালে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। তাই তো মৃত্যুর পরও তিনি স্থির থাকতে পারেননি। ছুটে এসেছিলেন তাঁর আদরের কন্যাকে বাঁচাতে।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা

	অ্যানাবলিক-স্টেরয়েডস	কর্টিকো-স্টেরয়েডস	উত্তেজনা-বর্ধক	বেদনানাশক মাদক	বিটা ব্লকারস	ব্লাড ডোপিং
ব্যবহার-জনিত ফল	পেশীর বৃদ্ধি এবং সহনশীলতা বাড়ায়।	আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী বাড়ায়, ক্লান্তি এবং ব্যথা কমায়।	সচেতনতা বাড়ায়। ক্লান্তি কমায়।	ব্যথা কমায় এবং প্রশান্তি আনে।	হৃৎস্পন্দন মন্থর করে মনঃসংযোগ বাড়ায়	সহন-শীলতা বাড়ায়
যেসব খেলায় সাধারণত ব্যবহার করা হয়	ভারোত্তোলন, ফুটবল, বডিবিল্ডিং	ফুটবল, বক্সিং কুস্তি	সমস্ত খেলা বিশেষতঃ সুটিং	সমস্ত খেলায়	তীরন্দাজী, সুটিং	দূরপাল্লার দৌড়, সাইক্লিং ইত্যাদি

এছাড়াও আছে ডাইইউরেটিক্স ড্রাগস যা দ্রুত ওজন কমায়। বক্সার এবং কুস্তিগীরেরাই এই ড্রাগস ব্যবহার করে।

ব্লাড ডোপিং ছাড়া সমস্ত রকম নিষিদ্ধ ড্রাগস গ্রহণই মূত্র পরীক্ষার ফলে জানা যায়। আই.ও.সি. আরও জানিয়েছেন, গবেষণা করে দেখা গেছে এই সব ড্রাগস নিলে পরে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন, অ্যানাবলিক স্টেরয়েড থেকে হৃৎপিণ্ড এবং যকৃতের অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ড্রাগস পিটুইটারী গ্রন্থি এবং অ্যাডরেনাল গ্রন্থির কাজ নষ্ট করে, কিডনীর সমস্যা দেখা যায়। ডাইইউরেটিক্স পাকস্থলী এবং পায়ে খিঁচুনি, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, কিডনী নষ্ট ইত্যাদি সৃষ্টি করে। উত্তেজক নারকোটিকস নেশাগ্রস্ত করে হৃদস্পন্দনের গতি পাল্টে দেয়। এর থেকে কোমা ও মৃত্যুও ঘটাতে পারে। বিটা ব্লকারস থেকে হাঁপানী ও মানসিক জড়তা আসে। অতএব তোমরা যারা ভবিষ্যতে অলিম্পিকে যেতে চাও তারা এখন থেকে এ ব্যাপারে সচেতন থেকো।

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

নতুন রিঅ্যাকটার—কামিনী

যে কোনো মৌলের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ পরমাণু। এই পরমাণু গঠিত হয় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক (-) এবং প্রোটন ধনাত্মক (+) আধানযুক্ত কণিকা। নিউট্রনের কোনো আধান নেই। পরমাণুর কেন্দ্রে ঠিকমতো আঘাত করলে সেটি ভেঙে যায় এবং বেরিয়ে আসে প্রচুর শক্তি। সেই শক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। যে যন্ত্র এই পরমাণু ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে বলে রিঅ্যাকটর। ভারতে বিভিন্ন পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে অনেক রিঅ্যাকটর আছে। কিন্তু সেগুলো ইলেকট্রন ও প্রোটনের শক্তি নিয়ে কাজ করে। নিউট্রন কণিকা তড়িৎ আধানবিহীন হলেও এর শক্তি খুব কম নয়। নিউট্রন নিস্তড়িৎ হওয়ার জন্য সহজেই যে কোনো পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এছাড়া এগুলি যে কোনো মৌলের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের মধ্যে চৌম্বক গতির সৃষ্টি করে। ফলে সহজেই যে কোনো বস্তুর গঠন জানা যায়। এর উপর ভিত্তি করেই পদার্থবিদ্যার নতুন একটি শাখা গবেষণা ও পঠনপাঠনের জন্য গড়ে উঠেছে যার নাম 'Condensed matter Physics'.

গবেষণার জন্য, নিউট্রনকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে দরকার বিশেষ ধরনের রিঅ্যাকটর। BARC (ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার) কেবলমাত্র প্রাথমিক গবেষণার জন্য তৈরি করেছিল এধরনের ছোট রিঅ্যাকটর যার নাম 'ধ্রুব'। তবে ধ্রুবর অনেক ত্রুটি ছিল। পরে তৈরি হয় পূর্ণিমা-২। পূর্ণিমা-২তে কেবল ইউরেনিয়াম ২৩৩ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেত। BARC এই সালের মার্চেই একটি নতুন ত্রুটিমুক্ত রিঅ্যাকটর তৈরির কাজ শেষ করে ফেলবে বলে জানিয়েছে। এর নাম কামিনী। কামিনী থোরিয়াম ২৩২ এবং ইউরেনিয়াম ২৩৩ উভয় জ্বালানী থেকেই শক্তি ও নিউট্রন উৎপাদন করবে। ভারতে থোরিয়ামের ভাণ্ডার অফুরন্ত। রাজস্থানের মরুভূমির তেজস্ক্রিয় বালি এবং কেরালার উপকূলের মোনাজাইট থেকে সহজেই প্রচুর থোরিয়াম ২৩২ পাওয়া যায়, যা ইউরেনিয়াম ২৩৩-এর মতো ব্যয়বহুল নয়। কামিনী তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে মাদ্রাজের কাছে কলপক্কমে ইন্দিরা গান্ধী পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে।

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (বৈশাখ সংখ্যার পর)

সকালবেলায় জার্মানরা যাত্রা শুরু করার আগেই গ্রামের সব লোক ব্যাপারটা জেনে গেলো। জেনে গেলো কী হতে চলেছে তাও।
বুদ্ধুগুলো হাসছে কেন? এতে হাসির কি দেখলো ওরা। প্রমোশন পেয়ে ফিরে আসি তারপর ওদের হাসি ঘুচিয়ে দেবো!
হাঃ হাঃ হা!
হেঃ হেঃ!
এখনো পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাক হয়েছে। এবার আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট পথটা ধরি।

মুক্তি বাহিনীর সেনারা পাহাড়ের আড়ালে ম্যাম'জেলের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ম্যাম'জেল এসে ওদের সব বললো।
এবার ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও ম্যাম' জেল। কিন্তু এরপর ওদের অবস্থা কি হয় দ্যাখো...
হাঃ হাঃ হাঃ

ম্যাম'জেল এক্স সাইকেলে করে তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে গেলো...
ঐ যে ওরা আসছে! সকলে তৈরি থেকো।
এ কী! এতো জার্মান! সশস্ত্র! ওরা আমাদের শেষ করে দেবে। আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না।
বুদ্ধু! ম্যাম'জেল যখন বলেছে কোনো ভয় নেই তখন নিশ্চিৎ থেকো আমাদের কোনো বিপদ হবে না।

বরখ্ বসে বসে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলো....তাকে হয়তো জেনারেল করে দেওয়া হবে...তখনই হঠাৎ....
গুলি চালাও... গুলি চালাও.. গুলি....
(চলবে)

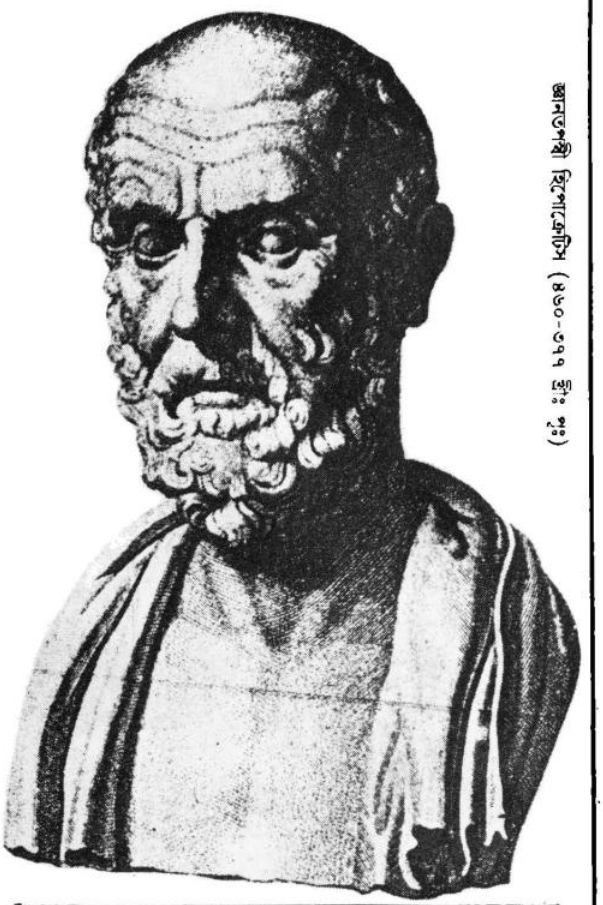

জ্ঞানতপস্বী হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭৭ খ্রীঃ পূঃ)

মন্ত্র থেকে মাদুলি

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। শেয়াল রাজার খুব অসুখ। ভুগতে ভুগতে হাড়িসার। কত ওষুধ আর পথ্য, কিন্তু জ্বর সারার নামটি নেই। রাজত্বে মহা অশান্তি।

শেয়াল রাজার রাজত্বে বেজি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডাক্তার—রাজবদ্যি। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল বেজি বদ্যির। রাজার অসুখ বলে কথা! খুব ভাল করে রোগী দেখল বেজি। অনেক পরীক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত মুখ ভার করে একটা অসুখের কথা বলল। খটমট তার নাম, উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভাঙবার যোগাড়।

শেয়াল রাজার কণ্ঠে হুঙ্কার, 'ওসব শক্ত নামের অসুখ জেনে কি লাভ বদ্যি? অসুখ সারাও, নইলে এই রাজ্য থেকে বিদেয় হও।'

বেজির মুখ ভার, 'এ রোগের ওষুধ আমার কাছে নেই মহারাজ।'

বেজি বদ্যির কথা শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল শেয়াল রাজা। বলল, 'তাহলে উপায়? কার কাছে ওষুধ পাব বলতে পার?'

লেজ দিয়ে কান চুলকে বেজি বলল, 'ডাইনী বুড়ির কাছে।'

'ডাইনী বুড়ি।' আকাশ থেকে পড়ল শেয়াল রাজা, 'কোথায় থাকে ডাইনী বুড়ি?'

বেজি বলল, 'আমি ঠিক জানি না মহারাজ, মিনি বেড়াল জানে।'

ডাক পড়ল বেড়ালের। ভয়ে ভয়ে সে রাজার সামনে এসে হাজির হলো। গর্জে উঠল শেয়াল রাজা, 'দুধ-মাছ খেয়ে দিনরাত ফুলছ মিনি। গায়ে-গতরে দশাসই। কাজ-কর্মে মন নেই। রাজ্যে যে, ইঁদুরে ছেয়ে গেল।'

মিউ মিউ করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল মিনি। আবার ধমকে উঠল শেয়াল রাজা, 'চোপরাও মিনি! সাত দিনের ভেতর যদি ডাইনী বুড়ির ওষুধ না পাই তাহলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাজত্বি থেকে বার করে দেব? দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব।'

'যে আজ্ঞে মহারাজ।' ভয়ে মিনির বুক শুকিয়ে কাঠ।

রাজা তো আদেশ করেই খালাস। ডাইনী বুড়ির সন্ধান ও জানে না। জানে বাঘ রাজা। পাশের রাজ্যের একছত্র অধিপতি রাজাধিরাজ, মহারাজ। শেয়াল রাজার ভয়ে ছুটতে ছুটতে বাঘের কাছে হাজির হলো মিনি।

বাঘ রাজা মহা খুশি, 'কী খবর মাসী? এদ্দিনে বুঝি মনে পড়ল।'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মিনি, 'বড় বিপদ বোনপো, বড় দুঃসংবাদ।'

'কেন? কেন?' বাঘের কণ্ঠে দুশ্চিন্তা।

'আমাদের শেয়াল রাজার অসুখ। ডাইনী বুড়ির ওষুধ চাই। আমাকে পথ বাৎলে দাও, ঠিকানা বলো, কোথায় থাকে সেই বুড়ি?'

বাঘ বললো, 'সে কি আর এখানে? অনেক অনেক দূরে। অনেক নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে তবে যেতে হয়। মাথাভাঙা পাহাড়ের কাছে প্রেতগুহায় ডাইনী বুড়ির বাস। তুমি অতদূর যাবে কি করে?'

'তাইতো! তাইতো! তাহলে কী হবে? কী করে পাবো ওষুধ?' মহা সমস্যায় পড়ে গেল মিনি।

মাসীর কষ্ট দেখে দুঃখ পেল বাঘ রাজা। বলল, 'ভেবো না মাসী, দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি। চলো আমরা চন্দনার কাছে যাই, চন্দনা পাখি উড়তে পারে। ডাইনী বুড়ির কাছে পৌঁছুতে ওর আর কতক্ষণ?'

মাসী আর বোনপো মিলে চলে গেল নদীর ধারে। সেই নদীর কোল ঘেঁষে মস্ত এক ঝাঁকড়াচুলো বটগাছ। গাছের মাথায় বাসা বেঁধে থাকে চন্দনা। তরতরিয়ে গাছে উঠল মিনি। চন্দনার পায়ে মাথা কুটল। সব বলল। চোখের জলে ভাসল।

'চন্দনা ভাই, তুমি আমাকে ডাইনী বুড়ির ওষুধ এনে দাও। আমার প্রাণ বাঁচাও।'

চন্দনা সবুজ পাখা মেলে হাসল, 'শান্ত হও মাসী। ডাইনী বুড়ির ওষুধ পেতে হলে ওকে খুশি করা চাই। তুমি পারবে?'

'বলো কী করতে হবে? কেমন করে খুশি করব?'

'তাহলে সাপের মাথার মণি এনে দাও। ডাইনী বুড়ির আংটির শখ। মণি দেখলেই গলে যাবে দেখো।'

সাপের মাথার মণি? কোথায় পাবে মিনি বেড়াল?

বাঘ সব শুনে বলল, 'তুমি মুশকিলে ফেললে মাসী। মণি কোথায় পাই বলো দিকিন? এ রাজ্যে সাপ আছে অনেক, মণি কারো নেই। আছে শুধু অজগরের। সে ব্যাটা জলের রাজা। বুড়ো হয়েছে বটে, চোখে ছানি পড় পড়—তবু মণি আগলে বসে থাকে দিনরাত। কার সাধ্যি চুরি করে? তবে একবার দেখতে পারো মাসী। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে যদি ম্যানেজ করতে পার। তাছাড়া উপায় কি?'

শেষ পর্যন্ত অজগরের কাছে হাজির হলো মিনি বেড়াল। নদীর পাড়ে বিকেলের নরম রোদে ঝিম মেরে শুয়ে ছিল জলের রাজা অজগর। মিনিকে দেখতে পেয়ে ফোঁস করে উঠল। মাথা তুলে কটমট চোখে তাকাল। বলল, 'কে রে তুই? কী চাস এখানে? এদিকে কোন মতলবে এসেছিস?'

ভয় পেয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল মিনি। কিছু বলতে পারে না শুধু কান্না আর কান্না। শেষে অনেক কষ্টে বলল, 'পেন্নাম হই দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রজা। তোমার নদীর মাছ খেয়েই তো বেঁচে আছি। শরীরটা টিকে আছে কোনোক্রমে। তাই তোমার বিপদের খবর পেয়ে ছুটে এলাম। রাজার বিপদ শুনলে কোন প্রজা ঠিক থাকতে পারে বল?'

অজগর ধমকে উঠল, 'চুপ কর ফচকে বেড়াল। কান্না থামা। ধানাই পানাই ছেড়ে আসল কথা বল। বিপদের কথা শোনা।'

মিনি বলল, 'তোমার হাঁটুর বয়সী নতুন এক অজগর আসছে দেখলাম। তোমাকে তাড়িয়ে জলের রাজা হবার শখ। বয়েস কম, গায়ের শক্তিও বেশি।'

অজগর ক্ষেপে লাল, 'বটে বটে, দুধের ছেলের এত সাহস। আমাকে তাড়ায় কার সাধ্যি? কোথায় বজ্জাতটা একবার খোঁজ দে, ওর রাজা হবার শখ মিটিয়ে দি।'

বেড়াল বলল, 'এই নদীর তলায় লুকিয়ে আছে দাদাঠাকুর। মাঝে মাঝে মাথা তুলে তোমায় দেখছে আর ফন্দি আঁটছে।'

লেজের ঝাপটায় জল কাঁপিয়ে ফোঁস করে উঠল অজগর। কিন্তু মাথার মণিটা নিয়েই ওর চিন্তা। মণি নিয়ে তো জলে ঝাঁপানো যায় না।

আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের

পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের

দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের

তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম. ও. করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

রাগের গলায় বলল, 'মণিটা এখানে রইল। তুই একটু পাহারা দে মিনি। আমি বজ্জাতটার রাজা হবার শখ মিটিয়ে দি।'

বলতে বলতে নদীর জলে ঝাঁপ দিল অজগর। মিনি বেড়ালকে তখন আর পায় কে? মণি নিয়ে একেবারে হাওয়া। চন্দনা পাখির কাছে পৌঁছে গেল সে।

চন্দনা উড়ে গেল সেই মণি নিয়ে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কত দেশ পেরিয়ে, নদী উজিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে প্রেত গুহায় এসে পৌঁছুল শেষ পর্যন্ত। ডাইনী বুড়ির পায়ের কাছে মণি রেখে পেন্নাম করল।

ডাইনী বুড়ি মহাখুশি, 'কী চাস তুই? কী চাস? এই আমার যাদুকাঠি। এটা ঘুরিয়ে যা বলবি ফলে যাবে। যা চাইবি তা পাবি।'

চন্দনা সব বলল—সব। মিনির কথা, শেয়াল রাজার কথা।

ডাইনী বুড়ি সব শুনল। ফোকলা দাঁতে হাসল। সাদা শনের জটাজটা চুলে হাত বুলিয়ে একটু ভাবল। অনেক অঙ্ক কষল, মন্ত্র পড়ল। বলল, 'গ্রহের ফের চন্দনা, স্রেফ গ্রহের ফের। আমাকে খুশি করেনি বলেই শেয়াল রাজার এত অসুখ। মিনিকে বলে-দিও। শুধু শেয়াল কেন এজগতের সবাই—মানুষ বল আর পাখিই বল—আমাকে খুশি না করলে সবারই এমন অসুখ হবে। আমি খুশি হলে সবার মঙ্গল, সবার ভাল। নইলে অসুখে ভুগে ভুগে শেষ।'

চন্দনা পাখি বলল, 'মণিটা তুমি নিয়ে নাও বুড়িমা। সাপের মাথার মণি। আমাদের শেয়াল রাজাকে ভাল করে দাও। মিনি বেড়ালকে বাঁচাও।'

ডাইনী বুড়ি মণি পেয়ে বেজায় খুশি। বলল, 'এই নে চন্দনা। মাদুলিটা যত্ন করে নিয়ে যা। এতে ওষুধ ভরে দিলাম, যাদুকাঠির একটুকরো অংশ। শেয়াল রাজাকে পরতে বলিস। অসুখ সারল বলে।'

মাদুলিটা মুখে নিয়ে চন্দনা আবার উড়ল। পৌঁছে গেল বেড়ালের কাছে। বেজি বদ্যির কাছে ছুটল মিনি বেড়াল! বদ্যিকে সঙ্গে করে শেয়াল রাজার সামনে হাজির, সঙ্গে মাদুলিতে ভরা একটুকরো যাদুকাঠি—ডাইনী বুড়ির ওষুধ।

তারপর? তারপর?

শেয়াল রাজা ভাল হয়ে গেল সে কথা আর নতুন করে বলতে হয় নাকি! ডাইনীর কুপ্রভাব থেকেই তো অসুখ, খুশি হলে অসুখ সারে, নইলে নয়।

সেই রূপকথার জগত। সেখানে ভূত-প্রেত, ডাইনী বুড়ি, শেয়াল রাজা আর মিনি বেড়াল। এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বুঝি মানুষের আধিব্যাধি। গ্রহ-নক্ষত্রের কুপ্রভাব, দেবতার রোষ, ডাইনীর অভিশাপের সঙ্গে মানুষের অসুখ-বিসুখ। রূপকথা পড়ার সময় এ সবই বিশ্বাস করে ফেলি যেন। বই বন্ধ করলেই ফিরে আসি বাস্তব জগতে। এ জগত তো আর কল্পনার রাজ্য নয় যেখানে যুক্তি তর্ক সব অচল। বাস্তব আর কল্পনার ভেতর হাজার ব্যবধান।

এই ব্যবধান ছিল না হাজার হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে। সেই আদিকাল থেকে অসুখ সারাতে চেয়েছে মানুষ। বাঁচতে চেয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র ও দেবতার রোষ থেকে। নিয়েছে তন্ত্র-মন্ত্র ও মাদুলির সাহায্য। প্রতিহত করতে চেয়েছে অশুভ সব শক্তিকে। মানুষের দুর্বল মনকে কাজে লাগিয়েছে তখন অন্য এক মানুষের দল। তথাকথিত চিকিৎসকেরা। অসুখের ওষুধ মানেই পুজো-আচ্চা, নানা অনুষ্ঠান, ঝাড়-ফুঁক, কবচ ও মাদুলি। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে দু'পয়সা করে খাচ্ছে তখন সেই পুরোহিত ডাক্তারের দল।

রুখে দাঁড়ালেন গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস। সেটা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ সালে তাঁর জন্ম। ধর্মকে চিকিৎসাবিদ্যা থেকে আলাদা করেছিলেন তিনি। হাজার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর অন্য এক সুর। তিনিই প্রথমে বললেন—ধর্ম মানুষকে পবিত্র করে। পবিত্র মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের অবস্থান। ভগবান আমাদের ভালবাসেন। তাঁর চোখে সবাই সমান। তাঁর রাগ হবে কেন? তিনি যে পরম করুণাময়, সর্বশক্তিমান। তিনি অসুখ দেবেন কেন? এর জন্যে মানুষ নিজেরাই দায়ী।

সেই গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসই প্রথম বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে অসুখ-বিসুখ, রোগ-ব্যাধিকে দেখতে চেষ্টা করেন। তন্ত্র, মন্ত্র, কবজ, মাদুলি দিয়ে রোগ সারাবার ধান্দাবাজ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিলেন। এখনকার চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি গুরু বললে বলতে হয় তাঁর নাম—হিপোক্রেটিস। রোগের কারণ স্বর্গে নয় এই মর্ত্যে, রূপকথার কল্পনার জগতে নয়, যুক্তিতর্কের জগতে। অসুখ আছে, অসুখের কারণও আছে। চিকিৎসকদের উচিত সেই কারণ বার করা। রোগীকে ভাল হতে সাহায্য করা।

জ্ঞানতপস্বী এই গ্রীক চিকিৎসক, বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতির জনক। হিপোক্রেটিসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

কিন্তু এই ভারতে? হাঁ, আমাদের ভারতবর্ষে হিপোক্রেটিস জন্মাবার বহু বছর আগে সেই বৈদিক যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল সব সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেসব কথা ভাবলে গর্ব হয় অবাক হতে হয়। বর্তমান জগতের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন, ভারতের মহান চিকিৎসক চরক-সুশ্রুতের কথা। তাঁরাই বলতে গেলে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক। থাক, সে সব কথা পরে।

বাবলুর ছবি আঁকা

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

বাবলু একটা ছবি আঁকছে। প্রথমে ভেবেছিল ওর দাদা কাবলুকে আঁকবে। কাবলুকে আঁকতে গিয়ে দেখল, ফুল হয়ে যাচ্ছে। ফুল তো সবাই আঁকতে পারে। ফুল আঁকবে না বাবলু। পাতা আঁকবে? কী পাতা? আম পাতা, না কাঁঠাল পাতা? আচ্ছা, আপেল গাছের পাতা কী রকম দেখতে হয়? এই রকম, নাকি এই রকম?

ন্নাঃ। বাবলু পাতা আঁকবে না।

আরে! এদিকটা তো বেশ মেঘের মতো দেখাচ্ছে, না? হ্যাঁ, তাই তো! মেঘের মধ্যে বাঘ, সিংহ, ফুল, প্রজাপতি সব থাকে। আবার মানুষও থাকে। বাবলু দেখেছে। এই তো এই মেঘটারও এখানটা সিংহের মাথার মতো। এদিকে একটা ডানা এঁকে দিল বাবলু। পরী! ওঃ! দারুণ হয়েছে।

আচ্ছা, কী মেঘে বৃষ্টি হয়? কালো মেঘে। বাবলু খানিকটা কালো রং মাখিয়ে দিল মেঘে। আঁকাবাঁকা দাগ কেটে হলুদ রং দিয়ে বিদ্যুৎ এঁকে দিতেই অবাক কাণ্ড!

মা! মা! দেখে যাও। দেখে যাও। বাবলুর চিৎকারে ওর মা ছুটে এলেন। এসে দেখেন ছেলে আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচছে।

কিরে, অমন করে চেঁচিয়ে ডাকলি কেন? কী হয়েছে?

দ্যাখ দ্যাখ মা, আমার মেঘটা থেকে কী রকম বৃষ্টি হচ্ছে? বলে বাবলু ওর আঁকা মেঘের ছবিটা ওর মাকে দেখাল। ওর মা বললেন, মেঘের ছবি এঁকে তার মধ্যে জল ঢেলে দিয়েছিস বুঝি? দুষ্টু কোথাকার! বলে কিনা আবার মেঘের থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

না মা! আমি একটুকুও জল ঢালিনি। তুমি বিশ্বাস কর। আমি মেঘের ছবিটাতে যেই বিদ্যুৎ এঁকে দিয়েছি, অমনি গুড়ুম গুড়ুড়ুম্ করে মেঘ ডেকে উঠল খাতায়। তারপরে.....

ওর মা বাধা দিয়ে বললেন, দূর পাগলা ছেলে। তাই কখনো হয়?

হ্যাঁ মা! সত্যি বলছি। আচ্ছা তুমি দ্যাখ। বাবলু বলল।

আমার এখন দ্যাখার সময় নেই এসব। ওদিকে রান্না পুড়ে যাচ্ছে বাবা।

না, ওসব জানি না। তোমাকে দেখতেই হবে। আমি এক্ষুণি তোমায় মেঘ এঁকে দেখাচ্ছি। এটকুখানি দাঁড়াও তুমি। বাবলু ওর মার আঁচল টেনে ধরল। ছাড়বে না কিছুতেই। দৌড়ে আর

অমন করে ডাকলি কেন?

একটা খাতা নিয়ে এল। তারপর তুলি দিয়ে অনেক কালো রং তুলে মেঘ আঁকল। তারপরে হলুদ রং নিয়ে ওর মাকে বলল, দ্যাখ মা, যেই হলুদ রং দিয়ে কালো মেঘের বুকে আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ এঁকে দেব, অমনি দেখবে কি কাণ্ড হয়!

এবারে বাবলুর মার মনেও একটা বেশ কৌতূহল হলো। বললেন, কই দেখি?

যেই না বাবলু হলুদ রং দিয়ে কালো মেঘের বুকে আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ এঁকে দিল, অমনি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! গুড়ুড়ুম্ গুড়ুম করে মেঘ ডেকে উঠল বাবলুর খাতায়। তারপর ঝম ঝম ঝম ঝম করে সে কী বৃষ্টি সেই মেঘ থেকে!

বাবলুর মা এতক্ষণ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। তাড়াতাড়ি বাবলুকে কোলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। রান্না মাথায় উঠল তাঁর।

হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে দৌড়ে এল। বাবলুর দাদা কাবুলকেও স্কুল থেকে নিয়ে আসা হলো। বেলা তখন বারোটা। ছেলেরা সবাই তখন অফিসে বা স্কুল কলেজে।

সবার মুখে একই কথা। কি ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা! মুখুজ্যে বাড়ির দেবুর ঠাকুরমা বললেন, বৌমা, আমি বাপু ভাল বুঝছিনে। ছেলে এলে বল ওঝা-উঝো ডেকে খোকাকে ঝেড়ে দিতে। কি জানি বাপু। এমন সোনার চাঁদ ছেলের ওপর আবার কোন শত্তুরের দৃষ্টি পড়ল।

বাবলুর বাবা কলকাতার এক ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। ফোনে খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বাড়ির সামনেই দেখেন বিরাট ভিড়। হৈচৈ করে তখনও লোক আসছে। পুলিশের ভ্যান, দূরদর্শন, আকাশবাণী আর খবর কাগজের গাড়ি, সব বাইরে দাঁড়িয়ে। বাবলুর বাবাকে দেখেই পুলিশের ও. সি.-কে পাড়ার ছেলেরা বলল, এই যে স্যার, ইনিই বাবলুর বাবা।

বাবলুর বাবা কোনোদিকে না তাকিয়ে ভিড় ঠেলে ঢুকে গেলেন বাড়িতে। ও. সি. দুজন কনস্টেবল নিয়ে ওনার পিছু নিলেন। আর চললেন দূরদর্শন, আকাশবাণী আর খবরের কাগজের রিপোর্টার ফটোগ্রাফাররা।

বাবলুর মা বাবলুকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে বসেছিলেন। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। চোখের জল শুকিয়ে গালে দাগ বসে গেছে। তাঁর চারপাশে পাড়ার সব মহিলারা। রান্না, চান-খাওয়া সব মাথায় উঠে গেছে।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে বাবলুর। আ—আ—আমার সোনার? কান্নায় ফেটে পড়লেন বাবলুর বাবা। কান্না হলো সমবেত কণ্ঠে। চলল খানিকক্ষণ।

এক্সকিউজ্ মি, ও. সি.র গলা পাওয়া গেল, আমরা আমাদের কিছু কাজকর্ম সেরে ফেলতে চাই মিঃ চক্রবর্তী।

ও হ্যাঁ, চলুন স্যার। এক্সট্রিমলি স্যরি। আসলে এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম ফোনটা পেয়ে....খানিকটা সামলে নিলেন নিজেকে বাবলুর বাবা।

ওঃ! বাবলু তখন কি করছিল তা-ই তো বলা হয়নি, তাই না? সত্যিই তো। খুব ভুল হয়ে গেছে। বাবলু কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। বাবলু ভাবছে, কি ব্যাপার রে বাবা! সবাই এত কান্নাকাটি করছে কেন? আমি কি করলাম আবার? আমি তো শুধু একটা মেঘের ছবি এঁকেছি। আর সেই ছবি থেকে অমনি সত্যি সত্যি বৃষ্টি হয়ে গেছে। সে তো মজার ব্যাপার। তা নিয়ে আবার হৈচৈ কান্নাকাটি করার কি আছে?

মার গলা জড়িয়ে ধরে বাবলু জিজ্ঞেস করল, বল না মা, কি হয়েছে? কাঁদছ কেন তুমি? ওরা সবাই কাঁদছে কেন? আকাশ মামা এসেছিল বুঝি?

কিছুদিন আগে বাবলুদের পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা যাবার পর যখন তাঁর মৃতদেহ দাহ করার জন্যে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বাবলু কি করে যেন দেখে ফেলেছিল। আর তারপরেই তার হরেক রকম প্রশ্ন—বিন্তির দাদুর কি হয়েছে মা? বিন্তির বাবা, কাকা সবাই কাঁদছে কেন? বিন্তির দাদুকে সবাই কাঁধে করে শুইয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন? এইরকম অজস্র প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে ওর মা সেদিন বাবলুকে বলেছিলেন, ঐ যে আকাশ মামার গল্প তোমায় বলেছিলাম বাবা, সেই আকাশ মামা এসে বিন্তির দাদুকে নিয়ে যাচ্ছেন। বিন্তির দাদু এখন ও-ই-ই আকাশে চলে যাবেন।

বাবলু ভেবেছে, সেই আকাশ মামাই বোধহয় আবার এলেন।

পুলিশের ও. সি. বললেন, মিঃ চক্রবর্তী, আপনার স্ত্রী আর বাচ্চাটিকে নিয়ে একবার ওই ঘরটায় চলুন, যেখানে ও ছবি আঁকছিল।

সারা ঘর পরীক্ষা করা হলো। বাবলুর মেঘ-আঁকা খাতা দুটো

তখনও ভিজে সপসপ করছে। ছবি তুলছেন দূরদর্শন আর খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা। রিপোর্টাররা খসখস করে স্টেটমেন্ট নিচ্ছেন আর লিখছেন। আকাশবাণীর সংবাদ বিচিত্রার একজন খ্যাতিমান প্রতিনিধিও এসে হাজির। কনস্টেবলরা বাইরে ভিড় সামলাচ্ছেন।

পুলিশের জেরার জবাবে বাবলুর বাবা বললেন, বাবলু বরাবরই ছবি আঁকতে ভালোবাসে। পরশুদিন ওর জন্মদিন ছিল। আমি অফিস থেকে আসার সময় এক সেট ওয়াটার কালার, গোটা কয়েক তুলি আর কাগজ নিয়ে এসেছিলাম। অন্য সব খেলনা নিয়ে মেতেছিল বলে ছবি আঁকার কথা কাল আর মনে পড়েনি, আজই বোধহয়.....

বাবলুর বাবার কথার খেই ধরে মা জানালেন, হ্যাঁ, আজ সকালে তুমি অফিসে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই ছেলে ছবি আঁকতে বসেছে। আমি তো ওধারে রান্না করছিলাম। হঠাৎ ওর 'মা মা' চিৎকার শুনেই ছুটে এলাম। এসে দেখি এই কাণ্ড।

দেখি বাবা, আর একটা ছবি আঁক তো তুমি! ও. সি. বললেন।

বাবলু সে কথা কানেই নিল না, বলল, তুমি পুলিশ? তোমাকে আমার একটুও ভয় করে না।

তাই বুঝি? বলে হো হো করে হেসে উঠলেন ও. সি.। এত চিন্তার মধ্যেও বাবলুর মা আর বাবার মুখেও একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

তুমি যদি মেঘের ছবিটা এঁকে দেখাও তাহলে তোমাকে আমি অনেক রং আর তুলি কিনে দেব। বাজখাঁই গলায় মিষ্টত্ব আনার চেষ্টা করলেন ও. সি. সাহেব।

আঁকব মা? মার অনুমতি চাইল বাবলু।

আঁক বাবা, খুব সুন্দর করে আঁক। যেমন করে আমাকে এঁকে দেখিয়েছ, সেই রকম করে।

বাবলু তুলি তুলে নিল। তারপর তুলিতে করে ঘন রং লাগিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে লাগলেন। বাবলুর মা-ই ছিলেন এর আগের বারে একমাত্র সাক্ষী। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের মনে একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন দোল খেতে লাগল। একটা অদম্য কৌতূহল, একটা অজানা আশঙ্কা, একটা রহস্য উদ্‌ঘাটনের নেশা সবাইকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

আমি মেঘ আঁকব না। বলে উঠল বাবলু।

তাহলে কী আঁকবে বাবা? ওর বাবা বললেন।

আমি পাখি আঁকব। টিয়া পাখি। আর মাছ। ম-স্ত বড়। আর বাঘ। আর হরিণ। আর কিছু না। আর কালীঠাকুর।

বেশ তো বাবা, তোর যা প্রাণ চায় তাই আঁক, মা বললেন।

সবুজ রং দিয়ে বাবলু একটা পাখি আঁকল। লাল রঙের ঠোঁট দিতেই সেটা হয়ে গেল একটা টিয়া। সত্যিকারের টিয়া।

দ্যাখ বাবা, উড়ছে কেমন টিয়া পখিটা! বাবলু আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

আরে তাই তো! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন উপস্থিত সবাই। ক্লিক্ ক্লিক্.....ছবি উঠল টিয়াটার। শিস দিতে দিতে চলে গেল টিয়াটা ঘরের বাইরে। ও. সি. আর একজন রিপোর্টার ছুটলেন

বাবলুকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন।

পেছন পেছন। কিন্তু পাখি তখন অনেক দূরের আকাশে মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে উড়ে চলেছে।

নাঃ, ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কোনো অপটিক্যাল ইলিউশান। এখন দেখছি মিরাকল। ব্যাপারটা কি বলুন তো? বাবলুর বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ও. সি.র দিকে।

মে বি এ কেস অফ হিপনটিজম, গম্ভীর গলায় বললেন ও. সি.।

কিন্তু ঐটুকু বাচ্চা ছেলে এতগুলো লোককে হিপনটাইজ করবে কি করে? একজন রিপোর্টারকে বলতে শোনা গেল, এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করেও সবার মধ্যে যেন একটা কিন্তু কিন্তু ভাব রয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! যে পাতাটায় পাখিটার ছবি এঁকেছিল বাবলু, সেই পাতাটা একদম পরিষ্কার সাদা হয়ে গেছে।

বাবলু এবার একটা মাছ আঁকল। জলজ্যান্ত মাছটাকে রীতিমতো হাতে করে নিয়ে গিয়ে পাশের পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এলেন ও. সি. স্বয়ং।

এবার একটা বাঘ আঁকছে বাবলু। বাবলুর মা ভয়ে চিৎকার

করে উঠলেন, না বাবলু! বাঘ আঁকিস না বাবা!

বাবলুর বাবা ওর হাত থেকে তুলিটা কেড়ে নিতে নিতে আদেশ দিলেন, না, আর নয় ঢের হয়েছে।

ও. সি. বললেন, ইয়ে আমি বরং একটু বাইরেটা ঘুরে দেখে আসি। বাঘের ভয়ে যে যার প্রাণ বাঁচাতে পালাতে লাগলেন।

বাবলু বলল, ঠিক আছে, আমি বাঘের দাঁত দেব না। থাবাতে নখ দেব না। তবে আর ভয় কি? বলেই ও একটা অন্য তুলি নিয়ে তিন আঁচড়ে বাঘটার মুখ এঁকে ফেলল। ব্যস! অমনি বাঘ বাবাজী 'হুম' বলে একখানা আওয়াজ ছেড়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। রিপোর্টার থেকে ও. সি. যে যার মারলেন দৌড়। বাবলুর মা জ্ঞান হারালেন, বাবলুর বাবা ভয়ে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন।

বাঘটা কিন্তু প্রাণ পেয়েই হালুম হুলুম শব্দ করে তাড়া করল পুলিশের ও. সি. আর রিপোর্টারদের। বাবলু আর ওর মা, দাদা, বাবাকে কিচ্ছু বলল না। এদিকে বাইরে তো সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। আচমকা একটা জলজ্যান্ত বাঘকে সামনে দেখেই পড়ি কি মরি করে যে যার দৌড়তে লাগল। মেয়েরা তো এ ওকে জড়িয়ে ধরে বিরাট কান্না জুড়ে দিল। আর ও. সি. সাহেব ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়তে লাগলেন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে গিয়ে ডিগবাজি খেল এক কনস্টেবল। আর তাই দেখে বাঘের সে কী হাসি। আর সে হাসি কিনা আবার একেবারে মানুষের মতো। ওমা! কথাও যে অবিকল মানুষেরই মতো!

হাসি একটু সামলে নিয়ে বাঘ বলল, বাবাঃ একটা ফোকলা নখ-না-ওয়ালা বাঘকেই আপনাদের এত ভয়? বলি, কাঁধে বন্দুকগুলো ঝুলছে কী কম্মে? অ্যাঁ? হিঃ হিঃ হিঃ..... হোঃ হোঃ হোঃ....হাঃ হাঃ হাঃ.....ছবির বাঘকেই যদি এত ভয়, তাহলে সুন্দরবনের বাঘ দেখলে..... হোঃ হোঃ হোঃ... নাঃ, আপনাদের সঙ্গে আর ইয়ার্কি করব না। কারুকে খাবার ইচ্ছে নেই আমার। আর খাবই বা কি করে? দাঁত কই আমার? বাবলুকে নেহাৎ ভালবাসি বলে একটু মজা করলুম। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আবার এখুনি ছবি হয়ে বাবলুর খাতায় ফিরে যাচ্ছি। গোস্তাকি মাপ করবেন ও. সি. সাহেব এবং রিপোর্টার স্যাররা। আমি চললুম, হাল্লুম.... হাঃ-হাঃ-হাঃ:.....বলেই বাঘ ছবি হয়ে গেল। আশ্চর্য!

বাঘ তো ফিরে গেল বাবলুর ছবিতে। এদিকে ও. সি. সাহেব নিজেকে একটু সামলে নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, হুঁ, যত্তোসব। দু-তিনজন কনস্টেবলকে ধমকে বললেন, তোমরা সব হাঁ করে কি মজা দেখছিলে নাকি? যত্তোসব অপগণ্ডের দল।

একজন কনস্টেবল একটু সাহস করে বলল, ইয়ে...স্যার আমরা তো গুলি চালাতেই চাইছিলাম। কিন্তু আপনার ঐ অবস্থা দেখে...

হিঃ হিঃ.....ভীতু, ভীতু। হিঃ হিঃ... তোমরা কি ভীতু। এ মা! একটা দাঁতফোকলা বাঘকে তোমাদের এত ভয়? খিলখিল করে হেসে উঠল বাবলু।

ও. সি. একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, খুব হয়েছে বাবলু। বড়দের সঙ্গে ইয়ার্কি করা ভাল নয়। তুমি বরং অন্য কিছু আঁক।

বাবলু এবারে একটা কালীঠাকুরের ছবি আঁকল। ইতিমধ্যে পাড়ার লোক আর রিপোর্টাররা সবাই ফিরে এসেছেন। ও. সি. সাহেব আগে বাঘের ছবিটাকে কুচিয়ে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা কালী বলে উঠলেন, কি করলি?

এ্যাঁ! মা কালী স্বয়ং কথা বলছেন! ব্যস, শুরু হলো প্রার্থনার ফিরিস্তি—মাগো! আমার ছেলের একটা চাকরি....মা! আমার প্রমোশন.... আমার মেয়ের বিয়ে মা!....চলতেই লাগল।

একজন তুলিটা নিয়ে একটা জবা ফুল এঁকে দিল মায়ের পায়ে। কিন্তু সে ফুল ছবিই রয়ে গেল, ফুটে উঠল না। সে কেঁদে ফেলল।

মা বললেন, দুঃখ করে লাভ নেই বাছা। বাবলু শিশু। ওর মন ফুলের মতো পবিত্র আর নিষ্পাপ। ও ওর মনের কল্পনায় যা রাঙিয়ে তোলে, তা-ই সত্যি হয়ে ওঠে। কারণ, ওর কল্পনার সরলতায়, শিল্পকে সৃষ্টি করার আন্তরিকতায় কোথাও কোনো খাদ নেই। তোমরা মনের মধ্যে স্বার্থ, কলুষ আর অহং নিয়ে এসেছ। তাই তোমাদের ছবিতে ব্যাকরণ ঠিক থাকে, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন থাকে না। নিষ্পাপ শিশু জগৎকে যে চোখে দেখে, তাই সত্যি। ওর মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই। তবেই তো বাবলুর তুলির টান এত সজীব আর প্রাণময়। তাই ওর আঁকা মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। ওর ছবির মাছ তোমাদের সত্যিকারের পুকুরে খেলা করে। ওর আঁকা পাখি মুক্তির আনন্দে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যায়। আর ওর ছবির বাঘ যখন সত্যি হয়ে ওঠে, তখন তোমরা, নামকরা সব সাহসীরা, ভয়ে আঁতকে ওঠ। তোমরা ভীতু। তোমরা অবিশ্বাসী। সব স্বার্থ, অহং, অন্যায় আর অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে যেদিন তোমরা শিশুর মতো সরল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে শিখবে, সেদিন তোমাদের ছবিও কথা বলবে। মনে রেখো, শিশুরাই এ জগতের সেরা সৃষ্টি। সেরা স্রষ্টা। কথাগুলো বলেই মা বিদায় নিলেন।

বাবলু তখন ওর তুলি আর রঙ দিয়ে অনেকগুলো শিশুর মস্তিষ্ক আর হৃদপিণ্ড আঁকল। তারপর সেগুলো সবাইকে একটা করে বিলিয়ে দিল। বলল, তোমরা সবাই তোমাদের মস্তিষ্ক আর হৃদপিণ্ডের বদলে যদি এই মস্তিষ্ক আর হৃদপিণ্ডগুলো বসিয়ে নাও, তাহলে তোমরাও আমার মতো ছবি আঁকতে পারবে।

সবাই মাথা নিচু করে ফিরে গেল।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

সে এক অজানা দেশ

তরুণ শংকর

কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে একটা জরুরী বইয়ের আশায় ঘুরছিলাম। পুজোর তখন দিন দুয়েক বাকি। ক'দিন একটানা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই ফুটপাতের ওপর রোদে রাশিকৃত বই অবহেলায় শুকোচ্ছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের গায় একটা স্টলের সামনে এমনই কিছু ভিজে বইয়ের স্তূপের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে একটা কালো রঙের ডাইরি হাতে এল। কৌতূহলবশতঃ পাতা উল্টে দেখি সেটা একটা নাম-না-জানা দেশের ভ্রমণের বিবরণ। ভ্রমণ-কাহিনীর প্রতি চিরকালই আমার একটা অসম্ভব দুর্বলতা আছে। তাই ওটা থলির মধ্যে নিজস্ব সঞ্চয়ে রাখলাম। পরে বহুবার ঐ ডাইরির প্রতিটি পাতা পড়েছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু আজ অবধি তার রহস্য ভেদ করে উঠতে পারিনি। তাই তোমাদের কাছে তারই কিছু পাতা হুবহু আমি তুলে ধরছি।

২/৩/৫৪: মাত্র কয়েকদিন হলো আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভাবছি এই অবসরে এমন একটা জায়গায় বেড়াতে যাব যেখানে পাহাড় ও সাগরকে পাব একই সঙ্গে। ম্যাপ খুলে আরব সাগরের তীর বরাবর সবে যখন আধো স্বপ্নে বিচরণ করতে শুরু করেছি এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল মন্টুর সাইকেলের ঘন্টি। মন্টু আমার সব চেয়ে ইন্টিমেন্ট ফ্রেন্ড। ও আমার সঙ্গেই হায়ার সেকেন্ডারী দিয়েছিল। হাঁক ছাড়লাম, ভেতরে আয়। উত্তর এল তুই-ই বরং বাইরে আয়। আমার ছোট মামা তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সাইকেল নিয়ে ওর বাড়ির পথে যেতে যেতে শুনলাম ওর লাল্টু মামা আমেরিকায় সেটেল্‌ড্। ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব পড়ান। এদেশে আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন।

ঘরে ঢুকে যাঁকে দেখলাম তাঁকে মোটেই ভারতীয় বলে মনে হলো না। যেন কোনো সাদা চামড়ার কেতা-দুরস্ত সাহেব। উনি আমার মনের কথা পড়ে ফেললেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমার মতো বয়সে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। গত পনেরো বছর হলো একটানা ওখানেই আছি। তাই ওদেরই একজন হয়ে গেছি বলতে পারো। তারপর বিশেষ কোনো ভূমিকা না করে তাঁর ভারত-ভ্রমণ পর্বে আমাদের সাথী করতে চাইলেন। আমরা তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগব, সেজন্য পুরো ভ্রমণের খরচ মকুব করে দিলেন। ঠিক হলো পরের সপ্তাহেই আমরা রওনা দেব।

১১/৩/৫৪: দু'হাজার কিলোমিটারের বেশি পাড়ি দিয়ে একদিন হলো এখানে এসেছি। ধূসর টিলার নিচে একচিলতে সবুজ প্রাঙ্গণের উপর মামাবাবু তাঁর তাঁবু পেতেছেন। চারিপাশটা অচেনা সব ঝোপঝাড়ে ভরা। দূরে বেশ কিছু নেড়া পাহাড় দেখা যায়। ওখানেই মামাবাবুর উদ্দিষ্ট উপজাতিদের বাস। কাক ভোরেই

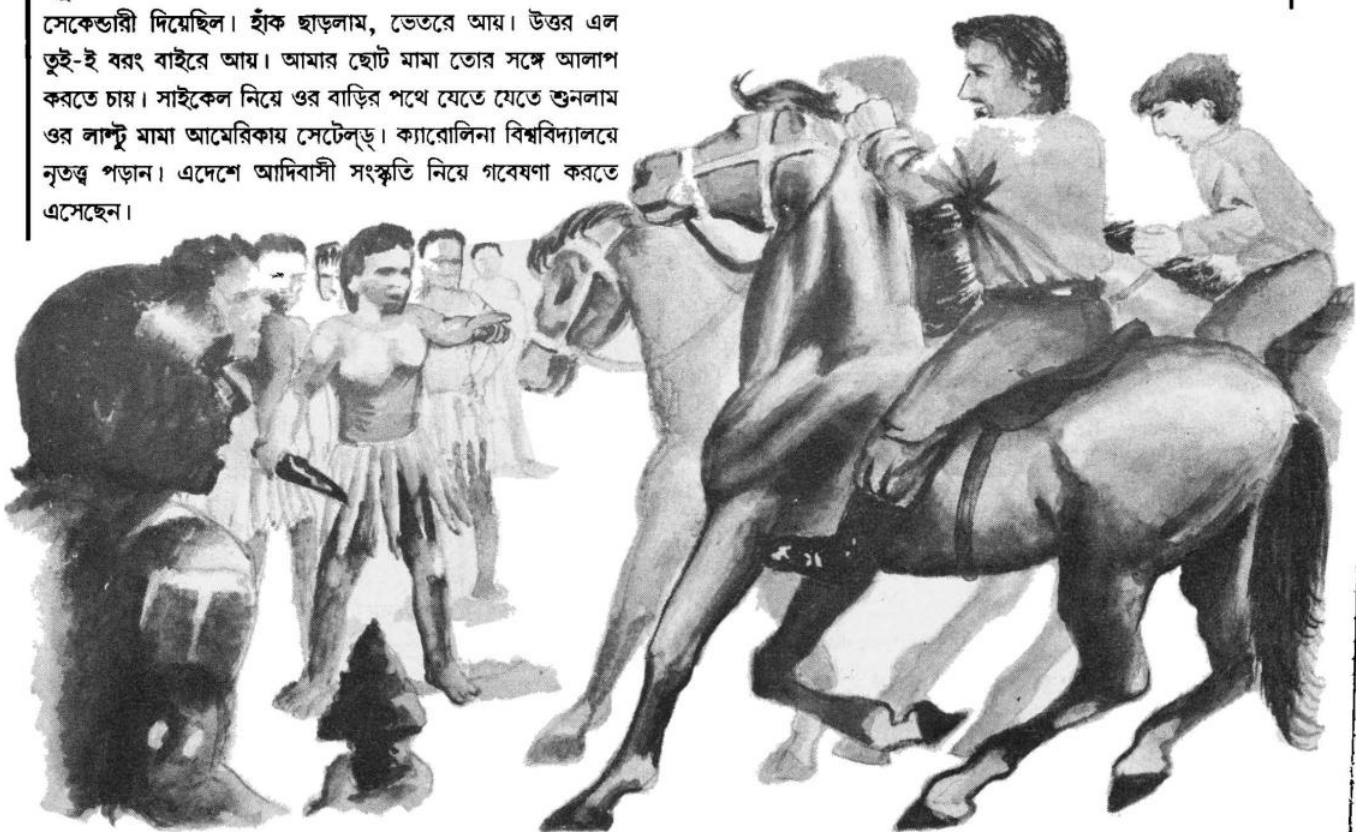

আমরা সেখানে রওনা হব। এজন্য মামাবাবু তিনটে দেশী ঘোড়া আনিয়েছেন। অনেকটা পথ ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাই এই ব্যবস্থা।

১২/৩/৫৪ : পূর্ব পরিকল্পনা মতো আজ আমাদের যাত্রা শুরু হলো। তবে ঘোড়া বেশি জোরে ছোটানো যাচ্ছে না, কারণ মাঝে-মধ্যেই পড়ছে ফণিমনসার কাঁটা ঝোপ ও ছোট বড় জলাভূমি। বেশ কয়েক ঘণ্টা চলার পর পাহাড়ের কাছাকাছি চলে এলাম। এখান থেকে আর সাগরের গর্জন তেমন শোনা যাচ্ছে না। এর পর আরও ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে। বেশির ভাগই মানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ। শিঙের মতো শিকড় মাটির উপরে উঠে এসেছে। খালি পায়ে এ পথে চলা যে কত কঠিন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খুব সাবধানে এগোচ্ছি, তখনই হঠাৎ কোথা থেকে ভুঁইফোড়ের মতো কতকগুলো অর্ধউলঙ্গ মিশ কালো মানুষ আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। হাতে তাদের প্রস্তর-যুগের অস্ত্রের মতো নানান আকারের অদ্ভুত সব পাথরের অস্ত্র। লাল্টু মামা কিন্তু ঘাবড়ালেন না। হাত পা নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন আমরা এসেছি বন্ধুভাবে। সারা গায়ে উল্কি পরা সবচেয়ে কালো ব্যক্তিটিকেই সর্দার বলে মনে হলো। সে আমাদের ইশারা করলো তাকে অনুসরণ করতে। সর্দার চলল আগে আগে। আমাদের নিয়ে পুরো দলটা তার পেছনে। অবশেষে একটা বিরাট গুহার সামনে সকলে থামলাম। গুহার ভেতর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল আর একটা দল। প্রত্যেকের কোমরে বাকল। সারা দেহে অদ্ভুত উল্কি। গুহার ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা শীতলতা অনুভব করলাম। আর ভেতরে জ্বালানো মশালের আলোয় লক্ষ্য করলাম দেওয়াল জুড়ে রয়েছে গুহাচিত্র যা সম্ভবত কোনো উদ্ভিজ রঙ দিয়ে আঁকা। মাঝে মাঝে আয়রন অক্সাইড দিয়ে ছবির মতো বর্ণমালা। মামা অস্ফুট বললেন, হেরোগ্রাফিক লিপি।

১৩/৩/৫৪ : আজ সারা দুপুরটা গুহাতেই ঘুমিয়ে কাটল। কারণ রাতে আমাদের সম্মানার্থে উৎসব হবে। সূর্য পাহাড়ের ওপারে হেলে পড়তেই শুনতে পেলাম একটানা ঢাকের গুমগুম আওয়াজ। সর্দার এসে আমাদের বাইরে নিয়ে গেল। দেখলাম গুহার সামনে খোলা জায়গায় সবাই জড়ো হয়েছে। ঠিক মাঝখানে বেদীর উপর বসানো ৩০ ফুট উঁচু বিশাল এক কিম্ভূতদর্শন মূর্তি। একদল মেয়ে-পুরুষ তাকেই ঘিরে নাচছে। নাচিয়েদের পরনে বাঁশের পোশাক, মাথায় লম্বা শিরস্ত্রাণ। নাচতে নাচতে আহু আহু বলে তারা মূর্তিটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। মশালের আলোয় বুঝতে অসুবিধে হলো না যে মূর্তিটি আগ্নেয়শিলা দিয়ে তৈরি। নাচ চলাকালীন আমাদের ঝলসানো মাংস খেতে দিল। মুখে তুলতেই বুঝতে পারলাম এ আমাদের চেনা কোনো মাংস নয়। মামা খাওয়ার শেষে মুখ খুললেন, বললেন, এ হলো অজগরের মাংস।

১৪/৩/৫৪ : যখন ঘুম ভাঙলো দেখি সূর্য মধ্যগগনে। গুহা ছেড়ে তিনজনেই বাইরে এলাম। তখনও সমস্ত দলটা গুহার ভেতরে ঘুমে অচেতন। এই সুযোগে জায়গাটা ঘুরে যতটা সম্ভব দেখে নেবো ঠিক করলাম। বেশ কিছুটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে আসার পর পাহাড়ের দক্ষিণে আরো গুহা দেখতে পেলাম। একটা গুহার মধ্যে রয়েছে সাপের মতো দেখতে অদ্ভুত সব মূর্তি। দেওয়াল জুড়ে অজস্র ডানাওলা সাপের ছবি। মামা বললেন, এগুলো মনে হচ্ছে এদের দেবতা অর্থাৎ কিনা সর্প-দেবতা। সাপেরই ছবি অথচ কোনো কোনো জায়গায় সাপগুলো খানিকটা ড্রাগনের চেহারা নিয়েছে।

গুহা থেকে বেরোতেই সর্দারের মুখোমুখি। আমাদের দেখতে না পেয়ে খুবই রেগে ছিল। মামা তাকে কি যেন বোঝালেন। মুহূর্তে তার রাগ জল হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল শিশুর মতো হাসি। ফেরার পথে পাহাড়ের ঠিক নিচেই উত্তর-পুব কোণে একটা বড় লেক দেখলাম। হাজার ফুট ওপর থেকে পাহাড়ী নদী জলপ্রপাত হয়ে লাফিয়ে পড়েছে লেকের মধ্যে। জলের ওপর জমে আছে মেঘের মতো সূক্ষ্ম জলকণা। অপরূপ সে দৃশ্য। বিহ্বল হয়ে দেখছিলাম। কিন্তু সর্দার ফেরার জন্য তাড়া লাগাল।

১৫/৩/৫৪ : আজ দুপুরে আমরা তিনজনে ফের লেকের ধারে চলে এলাম। সূর্যের আলো লেকের জলে পড়ে রুপোর মতো চিকচিক করছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে জলপ্রপাতের অবিরাম ধ্বনি। হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে প্রায় তিনশ' ফুট দূরে জলপ্রপাতের বিশেষ একটা জায়গায় জলস্তম্ভ তেড়েফুঁড়ে উঠল আকাশের দিকে। আর তারপরেই দেখা গেল একটা শুঁড়ের ডগা, দৈর্ঘ্যে যা প্রায় একশ ফুট তো হবেই। আচম্বিত এই ঘটনায় আঁতকে উঠলাম তিনজনেই। মামা বললেন, গতকালই সর্দার আমায় এই সরোবরের সর্পের কথা বলেছিল। একে এরা দেবতাজ্ঞানে বছরের একটা বিশেষ দিনে ঘটা করে পুজো করে। ওই সময় দু'তিনটে বাছুর ওর খাবার হিসাবে জলে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সবিস্ময়ে মন্টু প্রশ্ন করল, এটা কি ড্রাগন! মামা বললেন, ওই জাতীয়ই মনে হয়, প্লেসিওসর।

১৬/৩/৫৪ : আজ সর্দার আমাদের আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাবে বলে পাহাড়ের কিনারায় একখণ্ড ধূসর রঙের উত্তল ভূমির ওপর নিয়ে এল। বলল এ জায়গাটা তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় দুহাজার বছর আগে তৈরি করেছিল। এর পূর্ব-পশ্চিমের ঢালু জমির ওপর ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল পাথরের স্তম্ভ। পাথরগুলোর মাথা আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলো চক্রাকার পাথর দিয়ে। সর্দার একটা বিশেষ পাথর দেখাল। এর গায়ে কুড়িটা ছিদ্র। বলল, আমাদের কুড়ি দিনের মাসের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক আছে।

১৮/৩/৫৪ : গতকাল সর্দার মামাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছে। শেষরাতে পাথরের বিছানায় শুয়ে সেই গল্পই আমাদের নিচু স্বরে মামা বলছিলেন— এদের বিশ্বাস কোনো শ্বেত নক্ষত্র থেকে ছিটকে এসেছে এরা, যা পঞ্চাশ বছরে একবার ডিম্বাকৃতি

কক্ষপথে পাক খাচ্ছে। আজও তাই এরা প্রতি অমাবস্যার রাতে বিশেষ এক গুহার লম্বা টানেলের মুখে বসে তার মাধ্যমে সেখানে বার্তা পাঠায়। আগামী কালই আছে অমাবস্যা। আমরা অতি গোপনে গোটা দলটাকে অনুসরণ করে ওই গুহার আসল অবস্থাটা জেনে নেব।

১৯/৩/৫৪ : পরিকল্পনা মতো মাঝ রাতে গোটা দলটা রওনা দিতেই আমরাও বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে তাদের অনুসরণ করলাম। যেতে যেতে শুনতে পেলাম জলপ্রপাতের আওয়াজ। বুঝলাম গুহাটা লেকের কাছাকাছি। দূর থেকে সংগীতের মতো ভেসে আসছে আদিবাসীদের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ। সেই সুরের অনুরণনে মনের কোথায় কি যেন ঘটে গেল, সব ভুলে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানেই। প্রার্থনা থামতে সম্বিত ফিরে এল। দ্রুত পা চালিয়ে দলটার আগেই ফিরে এলাম গুহার মধ্যে।

২০/৩/৫৪ : দুপুরে ওদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সেই গুহা খুঁজে বের করলাম। গুহার ভেতরে ঢুকতে জলস্রোতের আওয়াজ ভেসে এল। মামা বললেন, এই টানেল এতই লম্বা যে এর শেষ প্রান্ত সাগরের কাছে পৌঁছে গেছে, তাই শোনা যাচ্ছে সাগরের গর্জন। টানেলের মাঝ বরাবর অনেকগুলো পাথরের মূর্তি। দেহের জায়গায় জায়গায় বেশ কিছু গোলাকার চাকতি। একটা চাকতিতে টান দিতেই মূর্তিটার মধ্যে এমন কম্পন শুরু হলো যে মুহূর্তে আমার সারা দেহ অবশ করে দিল। আলো-অন্ধকারে মনে হলো বুঝি মূর্তিগুলো জেগে উঠবে।

২২/৩/৫৪ : আরো দু'দিন কেটে গেল নতুন আর এক রহস্যের কিনারা করতে করতে। এদের কিছু লোকের অদ্ভুত এক জ্বরবিকার হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, জ্বর হওয়ার জন্য কোনো কষ্ট তারা টের পায় না। বরং সব কিছুই তাদের তখন বেশি ভালো লাগে। ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় ঐ রোগীর মৃত্যু হয়।

২৫/৩/৫৪ : আজ এই রকমই এক বিকারগ্রস্ত রোগীকে গুহার সামনের চাতালে এনে রাখা হয়েছে। এখনই শুরু হবে ডানাওয়ালা 'জ্যাটকোট্‌প' নামক সর্পদেবতার পুজো। বিশালাকার মূর্তিটিকে তাই টেনে আনা হচ্ছে চারটে বড় বড় পাথরের চাকার ওপর বসিয়ে। মূর্তিটি প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, আগুনের গোলার মতো এক জোড়া চোখ মুখোশের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। চাওড়া দেহ কিছুটা দৈত্যের মতো, মাথায় আবার বেশ লম্বা ছুঁচালো শিরস্ত্রাণ। সারিবদ্ধভাবে মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে হিসহিস একটানা শব্দ ভেসে এল। 'দেবতা জেগেছে' 'দেবতা জাগছে' বলতে বলতে গোটা দলটাই গুহার দিকে তড়িৎগতিতে ছুটে চলল। মামা বললেন, এই সুযোগ, চলো, পশ্চিমের পথ ধরে আমরা ছুটি।

জানি না কতটা পথ ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এসেছি। আমাদের সকলেরই দেহ গাছের কাঁটায় রক্তাক্ত। তবু বাঁচবার আশায় ফের দম নিয়ে ছোটা শুরু করলাম। ভোর হওয়ার আগেই ফিরে এলাম আমাদের তাঁবুতে।

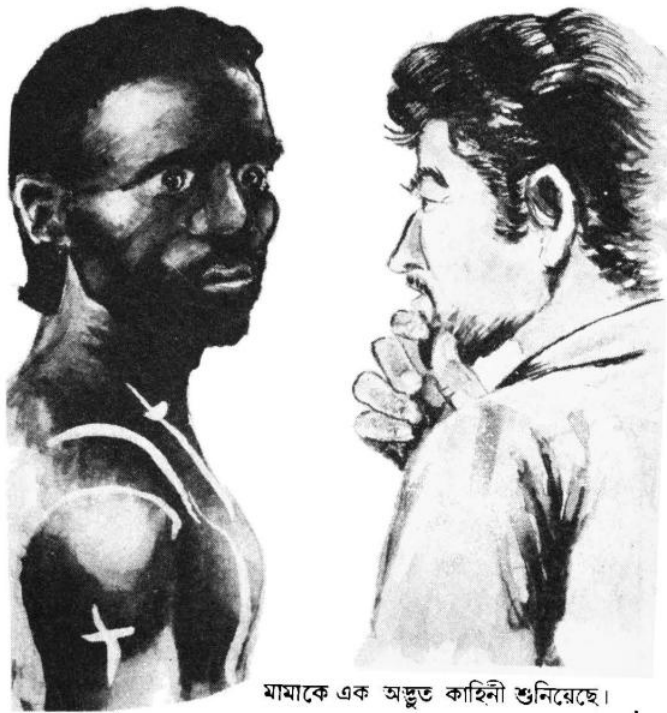

মামাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছে।

২০/৪/৫৪ : বেশ কয়েক দিন হলো কলকাতায় এসেছি। ফেরার পর থেকেই মামা ও মন্টুর সেই অদ্ভুত জ্বর শুরু হয়েছে। সারারাত তারা বাতাসের সঙ্গে কথা বলে। দিনের বেলায় কেমন আছে খোঁজখবর নিতে গেল ওরা বলে, বড় সুখে আছি। কোনো ডাক্তারই ধরতে পারছেন না কি হয়েছে। ইতিমধ্যে রক্তপরীক্ষায় পাওয়া গেছে এমন এক রোগ যা পৃথিবীর কোনো মানুষেরই নেই। তাই মেডিক্যাল টিম তাদের রক্ত সংগ্রহ করে রেখেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যদিও বাঁচানোর আশা মেডিক্যাল বোর্ড ছেড়েই দিয়েছে।

২৪/৪/৫৪ : আজ সকাল থেকে আমার আর কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। এরমধ্যে অবশ্য ডায়েরি লেখাটা বন্ধ করে দিইনি। সারা দিন এক রকম গেল। রাতে দেখি আমার চারিপাশে স্টেথো নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার গম্ভীর মুখে কী সব আলোচনা করছেন—বোধহয় আমারই বিষয়ে। আমি কিন্তু মেঘের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি, নাকে ভেসে আসছে ওজোনের গন্ধ আর আমার সারা শরীরে খেলা করছে বুদবুদের মতো তরল আলোর স্রোত।

ডায়েরিটা এখানেই শেষ। জানি না ওদের শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে। তবে ডায়েরি পড়ে বেশ বুঝতে পারা যায় ওরা কেউই বেঁচে নেই। অজানা অদ্ভুত অসুখে তারা মারা গেছে। কিন্তু কেন? কোথাই বা সেই জায়গাটা? সমুদ্র আছে, আছে পাহাড়, আছে জঙ্গল আর ঝরনা। ম্যাপ নিয়ে খুঁজতে বসলাম। জায়গাটার সন্ধান যদি পাই তাহলে ওখানে আমি যাবোই।

ছবি : প্রবীরকুমার সামন্ত

তিতলির যাদু-পুতুল
● পল্লব পূততুণ্ড
● দোলা পূততুণ্ড
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
গোম্পোর যাদু ক্ষমতার কথা না জানলেও তাকে দেখেই ভাল লেগে গেল তিতলির বন্ধুদের। এদিকে তিতলির বন্ধুর হাত থেকে গোম্পোকে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল এক ছিঁচকে ছোকরা। পার্কের রেলিং টপকে ক্রেতাদের ভিড়ে মিশে ধীরে সুস্থে পালাবার মতলব আঁটল…
একটা খালি প্যাকেট দরকার…
একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়! ক্রেতা মহিলার সঙ্গী লোকটি বেশ ষন্ডা আর রগচটা প্রকৃতির মনে হচ্ছে।
ছেলেটির হাত নিচে থাকায় ভিড়ের মধ্যে গোম্পোকে কেউ খেয়াল করছিল না। করার কথাও নয়…
লোকটার আর একটু কাছে গেলেই হিপ্ পকেটটা হাতের কাছে এসে যাবে! তখন…
ছেলেটার অলক্ষ্যে গোম্পো অভীষ্ট লোকটির পকেটে হাত ঢোকাল…
বেশ জানান দিয়ে পার্সটা বার করতে হবে। লোকটির টের পাওয়া দরকার!
?!
আরে, আমার মানি ব্যাগ!
গোম্পোর উদ্দেশ্য সফল হলো…
গোঁয়ার লোকটি যথেষ্ট চটপটে…
হতচ্ছাড়া বদমাশ! আমার পকেট থেকে পার্স চুরি!
!! ? আহ্-হ্!

আমি পার্স চুরি করিনি! সত্যি—
বটে! তাহলে এটা কী? তোমার পায়ের কাছে পড়েছিল—
ব্যাটা পকেটমার! আচ্ছা করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছি দাঁড়া!
আরে, ধোলাই লাগাও!
মার- মার-
বিল্টুদা, বাবলুদা ঐ যে দুষ্টু ছেলেটা, ওকে সবাই মারছে কেন?
নিশ্চয়ই এখানেও কোনও চুরি চামারি করেছে!
কিন্তু পুতুলটা কোথায় গেল?
খোঁজারু দলও এসে পড়ল...
এই যে বিল্টুদা, একপাশে ছিটকে পড়েছিল! ওঃ, গোম্মো!
আশ্চর্য! তোর হাতে পড়েই গোম্মোর মুখটা যেন খুশি খুশি হয়ে উঠল!
চোরটাকে দু এক ঘা দিলে হতো না?
থাক, তোকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না বাবলু!
আমি কখনও চোরকে মারিনি!
বেচারা এমনিতেই যথেষ্ট মার খেয়েছে!
তাছাড়া গোম্মোকেও তো ফিরে পেয়েছি। কী বল ঝিঙ্কি?
ঠিক!

(শেষ)

নতুন ধাঁধা

১। ধাতু নয়
আবরণ কয়।

প্রশান্ত কুণ্ডু ও মৌসুমী পাল
গৈরা/বাঁকুড়া

২। লবণ দেখে অকস্মাৎ
শুক্রশিষ্যের মাথায় হাত।

বিভাংশু দত্ত
আরামবাগ/হুগলি

৩। পান খেয়ে ফেলতেই পাখি,
উল্টে খেলো ডিগবাজি
সবজি ক্ষেতে লেজ ঝুলিয়ে
বসে আছেন বাবাজী।

শোভনকুমার দে
বারাসত/উঃ ২৪ পরগনা

৪। পেট কেটে পেট ভরে
আগাগোড়া খাও
লেজ বাদে ভারী? সবাই
স্বদেশের নাম গাও।

শঙ্কর দাশ
লোকপুর/বাঁকুড়া

বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ ১। টনক ২। বেতার ৩। ফুটবল ৪। নগর

বলো তো আমি কে?

সূত্র হেঁয়ালিঃ

বিখ্যাত একটি গল্পের চরিত্র আমি। আমার পরিচয় পেতে হলে নিচের সূত্রগুলো দেখঃ

সূত্র একঃ পৃথিবীতে আসি নলের মতো যানে। সেটা ইংল্যান্ডে একটা প্রকাণ্ড বালির গর্তে এসে নামে।

সূত্র দুইঃ অতি কষ্টে যান থেকে বেরিয়ে আসি আমি। আমাকে অনুসরণ করে আমার সঙ্গীরা। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি গর্তের ওপরে উঠতে বাধার সৃষ্টি করে।

সূত্র তিনঃ আমাদের দেখতে চারদিকে লোক ভিড় করে এলে আমরা ভয় পেয়ে যাই। ঠিক করি আমরা লড়াই করব। আমাদের ছোঁড়া আগুনে অনেক মানুষ মারা পড়ে।

সূত্র চারঃ যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব বেশি ছিল বলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এমন সব যন্ত্র তৈরি করে ফেলি যার দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের বাধা কাটিয়ে আমরা গর্তের ওপরে উঠে আসি। মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ঘর, বাড়ি, শহর পুড়িয়ে দিই। সৈন্যবাহিনী রুখতে এলে আমরা তাদেরও নির্মূল করি।

সূত্র পাঁচঃ হঠাৎ ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যায়। আমরা এমন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হই যাদের দেখতে পাই না, মারতেও পারি না।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমাকে ধরতে পারো বলবো অসাধারণ; দ্বিতীয় সূত্র থেকে হলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র হলে খুব ভাল; চতুর্থ সূত্র হলে ভাল; আর পঞ্চম সূত্র হলে মোটামুটি। আমার নাম?

পরের পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালা

এটি তৈরি করেছেন ঝন্‌ঝা ভট্টাচার্য, পূর্ব তেঁতুলবেড়িয়া, ২৪ পরগনা (দঃ)।

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ ১। ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ৩। ধাতু গলাবার পাত্র ৫। সুপারী কাটার যন্ত্র ৬। জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ ৮। বেতনের আরবী শব্দ ৯। কোমল স্বভাব ১০। পুণ্য স্থান ১১। হস্তী ১২। সংহত কেশ ১৩। শিশুপালিকা ১৫। সপ্তর্ষির অন্যতম সংহিতাকার ঋষি ১৭। উল্টেপাল্টে দেবপ্রধান ১৯। দংশক কীটবিশেষ ২১। রাত্রি ২২। মামার মা ২৩। নির্ধারিত বা শুভ সময়।

উপর-নিচঃ ১। বিশ্রী ২। রসবোধ আছে যে নারীর ৩। হস্তগত করা ৪। রক্ষা করে যে ৭। ঈষৎ লাল আভা ১২। গমনশীল ১৪। নীলকান্ত মণি ১৬। রজনী ১৮। ফারসীতে দরবার ২০। ওই ভাষাতেই বিবাহ।

বৈশাখ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

(ক) ১৯১৬; (গ) ১৬১৫; (ঘ) ১৪১৪; (চ) ১৭২০;

(ছ) ১৬১১; (ঝ) ১৭১৬; (ট) ১৮০০; (ঠ) ১৯৩৯

উপর নিচঃ

(ক) ১৮১৭; (খ) ১৯১৫; (গ) ১৯১১; (ঘ) ১৮২৯;

(ছ) ১৬১৩; (জ) ১৮০৬; (ঝ) ১৯১২; (ঞ) ১৯৩০

গোলকধাঁধা

রাস্তা করে বের হও তো দেখি

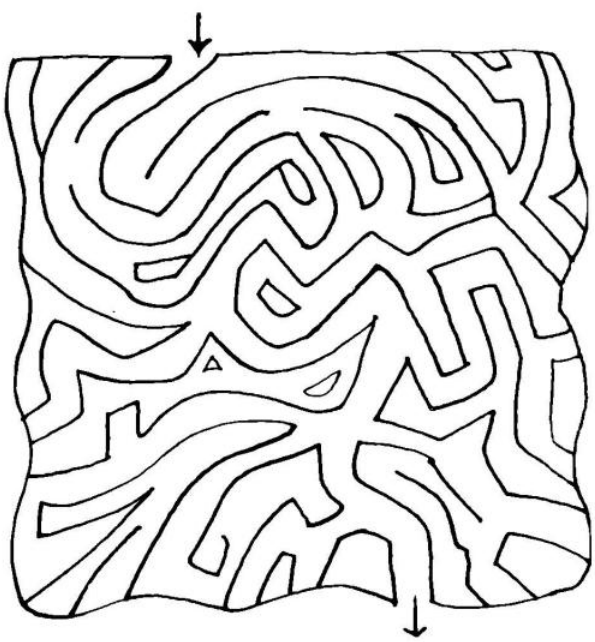

ফাল্গুন সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ **কলকাতা** ॥ সৌরভ, সৌনক, শঙ্কর, রঞ্জন, রূপা, অলকা, পার্থ, কেয়া ও অর্ণব/অণুশক্তি আবাসন, কলি-৬৪ ; পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, জয়, রুমকি ও দেবাশিস সাহা/বিজয়গড়, কলি-৩২ ; জয়, মুনিয়া, টিটো, ইন্দ্র, গোর্কি ও তানিয়া/হিন্দুস্থান পার্ক, কলি-২৯ ; ভাতুন, ঝুনাই, শ্যামাপ্রিয়া, বাবু, তাতাই, বুবুন, মিতুন, মাম, পিকু, তুলতুলি ও মোম/বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭ ; রুমা, সোমা ও শঙ্কর ভট্টাচার্য/ নন্দলাল মিত্র লেন, কলি-৪০ ; শ্যামল, ইলা ও সুজয়/বঙ্গশ্রী পল্লী, কলি-৬০ ; মা, বাবা, অতনু ও অনুজ চক্রবর্তী/লাবণী এস্টেট-সল্টলেক, কলি-৬৪ ; ভাস্কর দাশশর্মা/অকল্যাণ্ড রোড, কলি-১ ; পূবালী ও শৌভিক বসু/অটলবিহারী বসু লেন, কলি-১১ ; মালবিকা, হায়ারানি ও গৌরদাস সাহা/বেহালা সেন্ট্রাল গভঃ কোয়ার্টার্স, কলি-৬০ ; চুমকি, বুয়া, জয়, পিউ, সেফো ও কেটি/বাঁশদ্রোণী পার্ক, কলি-৭০ ; শীলা মণ্ডল/শুঁড়া থার্ড লেন,কলি-১০ ; বুলাই, টিঙ্কু, তিন্নী, সৌমী, অনুরাগ, অভিনব, দীপ্ত ও শ্রীজিৎ/যদুনাথ মুখার্জী রোড, কলি-৩৪ ; বাবা, মা ও ঋতুপর্ণা কর্মকার/সিমলা রোড, কলি-৬ ;

॥ **চব্বিশ পরগনা** ॥ সমীর ও অনাবিল ঘোষ/ ডায়মণ্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা ; সায়নী ও কৃত্তিকা ভট্টাচার্য/ভাটপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা ; প্রলয়শঙ্কর ঘোষ/ সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা ; বুবু, রাজু, রিঙ্কু, জয়া, পান্না, সুখেন, গৌর ও তপন/রাজপুর, দঃ ২৪ পরগনা ; বরুণ ও ভাস্কর দাশশর্মা/সিংহীবাগান, উঃ ২৪ পরগনা ; রিপন, পরশ, মামণি, রাহুল, পলাশ, বুলটি, বিলাস ও রাজীব/বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা ; সোমনাথ, অপর্ণা, সুশীল, জয়জিৎ দীপেশ, শশাঙ্ক, শেখর, পাঁচু, মেজোমামা, মেজোমামী, ডলি ও রাখাল/নবজীবন কলোনি, উঃ ২৪ পরগনা ; পূর্বাকর, অরুণদ্যুতি ও মালব্য দত্ত/ডায়মণ্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা ;

॥ **হাওড়া** ॥ মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/শিবপুর ; প্রিয়ব্রত ও প্রীতম মণ্ডল/ইছাপুর, সাঁত্রাগাছি ; অনিন্দ্য, সুপ্তা ও অশোক দে/দুইল্যা চড়কডাঙা, আন্দুল ; প্রভাত, কৌশিক, গীতা ও শান্তা/ সাতঘড়া লেন ; সৌম, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/অনন্তদেব মুখার্জী লেন, শিবপুর ; প্রভাত ও তপতী গঙ্গোপাধ্যায়/মুক্তারাম দে লেন ; পুলক মজুমদার ও অমলিন ঘোষ/মুক্তারাম দে লেন ; সুদীপ ও কাকলি/বি. গার্ডেন, শিবপুর ; অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা ও অরিন্দম/সদর বক্সী লেন ; রমেশচন্দ্র দত্ত ও নির্মলেন্দু ঘোষ/বারুইপাড়া, ডোমজুড় ; বাবুন, ফুচি, বোনা ও পাপাই/দানু বোস লেন ; পুলক, পিয়ালী ও পল্লব/মুক্তারাম দে লেন ; প্রদীপ, অপর্ণা, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন ;

॥ **হুগলী** ॥ অস্মিত, দিগন্ত ও কাজলী চক্রবর্তী/শিরিষতলা, শ্রীরামপুর ; কানন, ডলি, মায়া, মহামায়া, স্মৃতি, সবিতা, তনুশ্রী, গোপা, রূপা, রুমা, সোমা, সুজাতা, সস্মিতা, সঙ্গীতা, আশা, ববিতা, পৌষলী ও গোবেলো/চাতরা, শ্রীরামপুর ; দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/এল. এম. ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর ; টিটু, বিটু, রনি ও ডোডো/রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া ; পিউ, জুনি, রিম্পি ও সোমা/মাহেশ ; মৌসুমী মুখার্জী/চন্দননগর ; টাটু, রাজা ও বাবা/নর্থব্রুক জুট মিলস/বৈদ্যবাটি ; স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিন্দম নাথ/জমিদার রোড, শেওড়াফুলী ; নিনি ব্যানার্জী ও পামি মুখার্জী/ভদ্রকালী ; ঈশান, সুরঞ্জনা ও সুনীতি মুখার্জী/অশুতোষ চ্যাটার্জী লেন, মাহেশ ; মুনাই, মোম, মন্টি, দেবশ্রী, দামি, পুপাই ও সায়ন/ রেল গেট, বৈদ্যবাটী ; সপ্তর্ষি ব্যানার্জী/ বেলমুড়ি ;

॥ **বর্ধমান** ॥ ঋতুপর্ণা, সুশ্বেতা ও দেবশ্রুতি/বার্নপুর ; চন্দন, সুমন, কুমকুম, বিশ্বদেব, সোমা, বাবা ও মা/বার্নপুর কে.এস.ও.টেন ; সিদ্ধার্থ, অমিত, শম্ভু, তপন, তুষার ও তিমিরবরণ চাঁদ/গুসকরা ; মানস করগুপ্ত, চন্দন ও নন্দন রায়/মেমারী ; অষ্টমী, অপূর্ব, বৈশাখী ও টুসি খাঁ/অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর ; অঞ্জন ও অদিতি রায়চৌধুরী/কদমতলা, ভাতার ; শ্যামল, বরণী ও শুভ্রজ্যোতি বিশ্বাস/কুলটি, নিউ কলোনী ; অপু ও তিন্নি/কুনুস্তোরিয়া কোলিয়ারি ; শুভদীপ ও শুভজিৎ দাস/আসানসোল ; পূর্ণেন্দু ও প্রণব মণ্ডল/এ-জোন, দুর্গাপুর ; কাকু, শিল্পী ও রিমি মিত্র/ছোটনীলপুর ; সুমন, নন্দমামা, টুসটুস, আপ্পু ও দিদু/চাউলপট্টি, দুর্গাপুর ; মায়া, বাপ্পা ও রুমা মণ্ডল/রানীগঞ্জ ; মৌসুমী ও পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়/ডাঙ্গাপড়া, কালনা ; পৌলমী ও গৌতমী চ্যাটার্জী/বিধাননগর, দুর্গাপুর ; অদিতি, অরুন্ধতী, অর্পিতা, নন্দিতা, শতরূপা, মুন্নি, চিরঞ্জিৎ, সঞ্জিৎ, পম্পা ও মহুয়াদি/ধাত্রীগ্রাম ; সুজিত, সুভ্র, ছায়া ও অঙ্কুর সিংহ/ কুলটি ; চণ্ডী, হাসু, মামণি, শুভাশিস ও দেবাশিস মাধু/খান্দরা ; ঋষি, সামু,

বলো তো আমি কে-এর উত্তরঃ
আমি এইচ. জি. ওয়েলস-এর লেখা 'দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্লডস্'-এর একজন মারটিয়ান।

জানো কী !

- মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমিও আমরা শত্রুকে ছিনিয়ে নিতে দেবো না...কিছুতেই না...মেজর সোমনাথের ওয়ারলেস বার্তা আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেলো। ব্রিগেডিয়ার সেন শুনতে পেলেন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ। তারপর... ?

- রাজেন ঘোষ বল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ননীলাল তাকে বাধা দিতে এগিয়ে গিয়েই ভয়ে কেঁপে উঠলো। কি দেখলো সে, কেন কেঁপে উঠলো ?

- চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়াতেই চমকে উঠলো মনোজ। আয়নায় এ কার মুখ দেখছে ? সিধুমামা ? ...ঐ তো বসে। তাহলে ? কে...কে...আর্তনাদ করে উঠলো মনোজ... ?

- ঘোড়াগুলো এসে দাঁড়ালো ডাকবাংলোর সামনে। কি ব্যাপার ? জানলা খুলে ওরা ঝুঁকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, আতঙ্কে কেঁপে উঠলো দুই বন্ধু। কি দেখলো ওরা ?

- কনরাডকে খুশি মনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সার্জেন্ট। তার দু চোখে স্বপ্ন—এবার সে নিশ্চয়ই প্রমোশন পাবে। কিন্তু সার্জেন্ট জানে না তার জন্যে ম্যাম'জেল কি ফাঁদ পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদে কি পা দেবে সার্জেন্ট ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার আষাঢ় সংখ্যায়। সঙ্গে আরো অনেক কিছু।

শ্রী, সু ও বুয়ান/খালুইবিল ; তিমিরজ্যোতি, দেবজ্যোতি, মঞ্জরী, তারাশঙ্করী, বাগা, মল্লিকা, অনন্যা ও গৌতম/বেঙ্গুড় ; মান্মী ও রুদ্র মিশ্র/কোকোভেন কলোনী, নিউ সিটি, দুর্গাপুর ; মৌমিতা, দেবনীলা নাগ/বস্তিন বাজার, আসানসোল ; ছোটন, নয়ন, পারিজাত, মিনি, পলাশ ও অভিষেক ঘাঁটি/ঘাঁটিগলি, আসানসোল ; নিরঞ্জন, রুবেন, লক্ষ্মণ, রীনা, বুবুন ও জয়শ্রী করগুপ্ত/মেমারি ; কবিতা, সংহিতা, জয়, টয়, পিয়াল, ডাকু ও কীকু/এ. বি. এল টাউনশিপ, দুর্গাপুর ; তুলসী, মলয়, দীনেশ, মিলটন, চন্দ্রজিৎ ও আমিরুল/বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ;

॥ **মেদিনীপুর** ॥ স্বাতী, বোধিসত্ত্ব ও সোনামণি মাইতি/কালিকাখালি, মঠ চণ্ডীপুর ; বাপন, মোহন ও শোভন মান্না/অশ্বত্থতলা ; দ্বিজ দাস, কাজল ও রাজেশ চক্রবর্তী/খাপরেলবাজার ; মামা, টুকটুকি, টুবাই, মুমু ও বুড় পাল/আনন্দপুর ; চন্দন, শমিতা ও অর্পিতা খাঁ/হলদিয়া টাউনশিপ ; বাপ্পা, বুবাই, বাবলী, বুলটি ও বুম্বা/আচার্যবাড়ি, কালিন্দী ; ছবি, বীরেন ও রিঙ্কু/শরৎপল্লী ; বাবা, মা ও দিব্যমানিক্য সিনহা/হলদিয়া ; ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, দেউড়িবাড় কিরণ বিদ্যামন্দির/দেউড়িবাড়, শুকরল্লাপুর ; সৌরভ, পৌলমী, পাপু, পপি, শিবানী ও শ্রীধর সামন্ত/কাখুরিয়াবাড়ি, কিসমতবাজকুল ; সূর্যকান্ত, দেবনারায়ণ ও বিজয়কৃষ্ণ পাল/রাধাপুর ; সোমা, সাথী, সুনন্দা, দেবযানী ও সন্তোষ রায়/গড়বেতা ;

॥ **বাঁকুড়া** ॥ জয়ন্ত, সুশান্ত, সুচিত্রা, সুদীপ ও শৌভিক মণ্ডল/ রানিবাঁধ ; শুভময়চার ও সূচনা বিশ্বাস/তিলুড়ী ; আশামুকুল ও বেলা রায়/শালবাগান, বিষ্ণুপুর ; সোমনাথ রুদেন্দ্র ও মণিদীপ রায়/শালবাগান, বিষ্ণুপুর ; জয়দীপ ও জয়শ্রী রায়/উখড়াডিহি ; টুটু, টুম্পা, নীলু ও রাজু/লোকপুর ; গঙ্গা ও টুম্পা/ প্রতাপবাগান ; অনুপম, রাখী ও অপর্ণা/হরীতকীবাগান, কেন্দুয়াডিহি ; বাপী, বাবু, বন্দনা ও শম্পা রায়/প্রতাপবাগান(উঃ) ; জিকো, জলি ও প্রদীপদাদু/রতনপুর ; তপতী, তাপসী খাঁড়া ও বাবুন ব্যানার্জী/বিষ্ণুপুর রেলওয়ে কলোনী ; হীরেন, মদন রায়, রামপ্রসাদ ও দেবীদাস ব্যানার্জী/চাতরা মোড় ; মিলটন, কল্লোল, মৌসুমী ও বুবাই/মনোহর ;

॥ **পুরুলিয়া** ॥ কল্পনা, বিকাশ, পলাশ ও মৌসুমী/লাগদা ; কালিদাস চক্রবর্তী, দীপককুমার চৌবে ও শুভ্রাংশু বসু/আনাড়া ; শান্তি মাজি, সুবল ও মোহন মণ্ডল/রঘুনাথপুর ; মোহন, কৃষ্ণ, তন্ময়, মৃন্ময়, কাঞ্চনেশ্বরী ও বুলু মণ্ডল/রঘুনাথপুর ; অজয়দা, সুনীতা বৌদি, সুজয়, সপ্তু, শম্পা ও সুচি/জবররা ; পিঙ্কু, অনিতা, রাজু, মধুরিমা মাজি ও বুলু মণ্ডল/বেনিয়াশোল,আদ্রা ; পাপাই ও টুটাই/নামোপাড়া, রথতলা ; পল্লব ও সুশ্বেতা ঘোষ/নীলকুঠিডাঙা ; বৈশাখী ও কৌশিক চৌধুরি/এস.সি. সেন রোড ; জয়দেব চৌধুরী (বাদশা)/মধুপুর, মানবাজার ;

॥ **মুর্শিদাবাদ** ॥ তপন মিশ্র, তন্ময় মণ্ডল ও কৌশিক পাল/ ফারাক্কা ব্যারেজ ; শৈবাল, শেখ কবির ও সুকৃতি/ ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনী ; ঐন্দ্রিলা, ইন্দ্রজিৎ, প্রসিত ও প্রতিম মুখোপাধ্যায়/গোরাবাজার, বহরমপুর ; নির্মলেন্দু ও শরদিন্দু প্রামাণিক/জগন্নাথপুর ; অংশু, টুকটুকি, মা, বাবা, ছোট কাকিমা, মুকুলিকা ও কালীকুমার রায়/লালদীঘি, বহরমপুর ; মন্দিরা ও মধুরিমা মিত্র/মধুপুর রোড, বহরমপুর ; বুদ্ধদেব ও জগা মুখার্জী/মধুপুর রোড, বহরমপুর ; বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়/বনবিহারীপাড়া, জঙ্গীপুর ;

॥ **নদীয়া**। মিঠু ও সূচনা বিশ্বাস/উত্তর কালীনগর, কৃষ্ণনগর ; দেবু, রিন্টু, দীপ ও খতু/ গোলপটি, কৃষ্ণনগর ;

॥ **বীরভূম** ॥ লাল, মামণি, মিনু, সোমনাথ ও গার্গী/স্কুলবাগান, বোলপুর ; আবৃতা, আবির ও নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়/বোলপুর ;

॥ **জলপাইগুড়ি** ॥ সমর, সাধন দে ও সুপ্রিয়া দাস/কামাখ্যাগুড়ি ; রিতম, অদিতি, খোকন কাকু, সাধন কাকু, বাবা ও মা/আলিপুরদুয়ার জংশন ;

॥ **উত্তর দিনাজপুর** ॥ সুবাস, সায়ক ও রুমা দে বিশ্বাস, মনন বসু/ডালখোলা ;

॥ **দার্জিলিং** ॥ মা, ধর্মদাস ও বেলা চক্রবর্তী/দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ;

॥ **মালদা** ॥ দীপরঞ্জন বর্মা ও স্মৃতি সাহা/পিরোজপুর ;

॥ **বিহার** ॥ বাবু ও ভল্টু রায়, মিঠু, টিটু, পিকু ও মু ভট্টাচার্য, তাতন মুখার্জী/সুদাম ডি. সেন কলোনী, ধানবাদ ; জয়ন্ত, অসীম, রাজা, পিন্টু, ছটু, টিঙ্কু, রাজু, দেবু, মধু, পঙ্কজ, বিকাশ, প্রকাশ ও বিবেক/চাইবাসা, সিংভূম ; কাকীমা, পিঙ্কু ও বিভাস/আই.এস.এম, ধানবাদ ; ইন্দ্রজিৎ, মলয়, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিমল, দয়ানিধি, মানিক ও আশিস/সিংভূম ; রাজু, সীমা, রুদু, পুতুল, রেখা, ভুবন, মিঠু, টুলু, আলো, মানস, তাপস, জয়ন্ত, স্বপন, রাজকিশোর, সৌমিত্র ও শম্ভু/কেকপড়া ; জলু, মাধব, টুটুন, বাবলু, গোপেশ ও দাদু/নীতিসংঘ মোহলীশোল, সিংভূম ; দ্বিজু সেনগুপ্ত ও মীনা সেনগুপ্ত/জামশেদপুর ; দেবু, বাবু, তপু, নেবু, সোমা, রূপা, মমতা, আদর ও পুতল/কোকপাড়া ; নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়/গয়া ; মা, বাবা, দাদু, কৌশিক ও সৌমিক/চিরকুণ্ডা ;

॥ **আসাম** ॥ উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং ; স্নিগ্ধা, বাবন, শান্তু, সুমী দে ছোটকাকু/নিউদিরিয়াল চা বাগান, ডিব্রুগড় ;

॥ **গুজরাট** ॥ বৈদ্যনাথ, কৃষ্ণা ও ইন্দুভাতি রায়/বরোদা।

মাঝ আকাশে হা-রে-রে-রে

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোনো এক রবিবারের শান্ত দুপুর। আমস্টার্ডমের স্কিফল বিমানবন্দর। দুদিকে বিশাল ডানা মেলে ওড়ার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল অতিকায় এক জাম্বো জেট, নাম মিসিসিপি। কে.এল.এম. সংস্থার প্রতিটি বিমানই নদীর নামে। বিমানটিকে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘপথ। বেইরুট-দিল্লি-ব্যাঙ্কক হয়ে টোকিও। ক্যাপটেন আইজ্যাক রিস্যু সেদিন ছিলেন মিসিসিপির সর্বময় কর্তা। তিনিই ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাবেন ঐ সুদীর্ঘ আকাশপথে।

চমৎকার আবহাওয়া আর পরিষ্কার আকাশ থাকলে যে কোনো বৈমানিকেরই মন ভাল হয়ে যায়। আইজ্যাকেরও তাই হয়েছিল। বিমানকে হাওয়ায় ভাসাতে না ভাসাতেই সে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতে মিসিসিপি পৌঁছে গেল বত্রিশ হাজার ফিট ওপরে। বিমানটিকে অটো পাইলটে সেট করার কথা তিনি যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই পিঠে একটা খোঁচা লাগল তাঁর।

মাথা ঘোরাতেই চোখে পড়ল কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা তিন রহস্যময় মানুষ। তাঁর অজান্তে কখন ঢুকে পড়েছে ফ্লাইট ডেকে। একজন পিস্তল হাতে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, অন্য দুজন পাহারাদারি করছে দরজার সামনে। তারাও সশস্ত্র। পিস্তল হাতে দলপতি দস্যুটা বলল, আমরা প্যালেস্তাইনের লোক। দেশের ভাল চাই। তোমার সাহায্য দরকার। আমাদের কথামতো চললে বেঁচে যাবে মিসিসিপি, নয়তো এতগুলো মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি।

কী করতে বল আমাকে? ক্যাপটেনের ঠাণ্ডা স্বর।

আপাতত চল দামাস্কাস।

নামল মিসিসিপি অসহায়ভাবে। কিন্তু সেখানকার সরকার ওদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চাইলেন না। বিমানটিকে জ্বালানি দিতেও অস্বীকার করলেন তাঁরা। বেগতিক বুঝে দস্যুরা আবার ওড়ালো মিসিসিপিকে। পরের গন্তব্য সাইপ্রাস। না, ওখানকার সরকারও কোনও দাবি-দাওয়া শুনতে রাজী নন। সুতরাং আবার ওড়ো, চলো অন্য কোথাও। এবারে লিবিয়ার ত্রিপোলি শহর। নামার অনুমতি পাওয়া গেল। এটুকুতেই বিমানদস্যুরা ভেবে নিল, হয়তো এখানে একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবে।

ওরা একটু বেশিই আশা করেছিল। ভেবেছিল, কথাবার্তা চালাতে সরকারি তরফ থেকে কয়েকজন হাজির থাকবে বিমানবন্দরে। কিন্তু বিমান ত্রিপোলিতে নামতেই ওখানকার সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনও কথাই হতে পারে না। আশাহত হয়ে ভয়ঙ্কর রকমের ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ওরা। ক্যাপটেনের পিঠে পিস্তলের নল ছুঁইয়ে দলপতি আদেশ করল, ওঠ। চল চটপট। অন্য দুজন দস্যু ততক্ষণে চলে গেছে যাত্রীদের কাছে। সমস্ত যাত্রীদের বিমানের পেছন দিকে জড়ো করে তাদের মাথার ওপর ডিনামাইট ধরে থাকল তারা। ক্যাপটেনকে টেনে হিঁচড়ে এনে দলপতি সেই দৃশ্য দেখিয়ে বলল, প্লেন ওড়াও, নইলে এখুনি সবাইকে মেরে ফেলব।

ক্যাপটেন আইজ্যাকের কথা একবার ভাব। দস্যুদের পিস্তলের নল মাথায় ঠেকানো, সেই অবস্থাতেই মিসিসিপিকে একবার বিমানবন্দরে নামাও আবার তাকে নিয়ে আকাশে ওড়ো। এতটা টেনশন আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়! আইজ্যাকও আর পারছিলেন না। যাত্রীদের জীবন, বিমানের নিরাপত্তা, নিজের প্রিয়জনদের কথা ভিড় করে আসছে তাঁর মাথায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে

পিস্তলের খোঁচা খেয়ে মরিয়া হয়ে ভাবলেন, এদের হাতেই যদি জীবনটা যায় তো যাক, আর পারা যাচ্ছে না।

মিসিসিপিও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বারে বারে নামা-ওঠায়। যন্ত্র হলেও একটা বিমানের প্রতিটি ওঠা-নামার পেছনে থাকে কত মানুষের মনোযোগ, সেবা আর তরিবৎ। তবেই না সে নির্বিঘ্নে পাড়ি দেয় মাইলের পর মাইল। বিমানটিকে চালু করতে গিয়েও আইজ্যাক থমকে গেলেন। সামনে তাকিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির। দেখলেন রানওয়ের মুখেই সার সার যুদ্ধের ট্যাঙ্ক দাঁড় করানো আছে। উদ্দেশ্য মিসিসিপিকে আটকানো। দৃশ্যটি দেখে বুঝি মনে মনে খুশিই হলেন ক্যাপটেন। যাক এবারে তাহলে মুক্তি।

পিঠের বদলে ঠাণ্ডা নলের খোঁচাটা এবার এল গলাতে। দাঁতে দাঁত ঘষে দলপতি জানাল, এই মুহূর্তে ঠিক কর, তোমার যাত্রীরা বাঁচবে না জ্বলে খাক হয়ে যাবে। এক থেকে পাঁচ গুনছি।

এতক্ষণে সত্যিই ভয় পেলেন ক্যাপটেন। ঐ ট্যাঙ্কের দুর্ভেদ্য প্রাচীর পেরিয়ে ওড়া যে অসম্ভব! এদিকে না উড়লেও এতগুলি নিরীহ যাত্রীর প্রাণ যাবে। ঠাণ্ডা নলের ভয় নয়, অসহায় ঐ মানুষগুলোর মুখ তাঁকে বিচলিত করে তুলল, যাদের মাথার ওপর ধরা রয়েছে ডিনামাইট। স্ত্রী পুরুষ বাচ্চা সবার মুখে বাঁচার সে কি করুণ আর্তি! মনের ভেতর কচি কণ্ঠে কে যেন বলে ওঠে, 'আই'ল বি লাইক ইউ পাপা।' নিজের শিশুপুত্রের কথা মনে পড়ে তাঁর। আর ইতস্তত করেন না আইজ্যাক।

সবাইকে অবাক করে, মিসিসিপির ইঞ্জিন চালু হলো পূর্ণ বেগে। ক্যাপটেন লক্ষ্য করেছিলেন, পাশেই একটি নতুন রানওয়ে তৈরি হচ্ছে। যা থাকে কপালে ভেবে সেই কাঁচা রানওয়ের ওপর দিয়েই দৌড় করালেন অতিকায় মিসিসিপিকে। ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলল মিসিসিপি। কিন্তু কোনো অঘটন ঘটল না। দক্ষ ক্যাপটেনের হাতে অবশেষে সে পোষমানা পাখির মতো ভেসে পড়ল অসীম আকাশে। বিমানবন্দরে উপস্থিত সকলে তো বটেই, খোদ ক্যাপটেন পর্যন্ত হতবাক। বিশাল চেহারা নিয়ে কি করে উঠল মিসিসিপি ঐ রকম কাঁচা রানওয়ে থেকে?

এইবার দলপতি পিস্তল সরিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল। বলতে কি এতক্ষণে সে প্রথম চাইল বন্ধুর মতো। তার চোখে মুখে একটা মুগ্ধ ভাব। বলল, বাঃ, দারুণ। ক্ষমতা থাকলে বিশ্বের সেরা বৈমানিকের পুরস্কারটা তোমাকেই দিতাম হে। এবারে মাল্টার দিকে চল তো বাপু। দেখা যাক সুবিধে হয় কিনা।

মাল্টার নাম শুনে, কপালে রেখা পড়ল ক্যাপটেনের। কেন না ঐ ছোট্ট দ্বীপটির বিমানবন্দরে তখনো অবধি অতিকায় জাম্বো বিমান নামেনি। জাম্বোকে নামানোর কোনও ব্যবস্থাই নেই সেখানে। তবু কি ভেবে যেন ক্যাপটেন পরম সুখ অনুভব করলেন। শরীর আর নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়া সত্ত্বেও তিনি ঐ অপরিসর রানওয়েতে মিসিসিপিকে নামালেন, আর তা সম্পূর্ণ নিরাপদেই।

তেল চাও, নির্দেশ দিল দলপতি। পুরো ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নেবে। এখানে দাবি-দাওয়া জানিয়ে কোনো লাভ নেই।

ক্যাপটেন তেল নিলেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লিটার। তেল পাম্প করে তুলে দিয়ে তেলের ট্যাঙ্কার সরতেই সেই পুরনো আদেশ, এবার উঠে পড়। চল ইস্তামবুল।

ক্যাপটেন নিরুত্তর। ওঠার কোনও ইচ্ছেই যেন তাঁর নেই।

কি হলো? চল, তাড়া দিল দলপতি। ওরা আর ততটা নিষ্ঠুর নয় ওঁর সঙ্গে। আইজ্যাককে ওরা এখন বিশ্বাস করছে।

দুঃখিত, ছোট্ট করে জবাব দিল আইজ্যাক। এই রানওয়ে দিয়ে এত বড় বিমানকে তোলা শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব।

কেন?

যাত্রী আর প্রচুর তেল নেওয়ার ফলে বিমানের ওজন সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। এছাড়া চাকার অবস্থা ভাল নয়।

উড়তেই হবে যদি বাঁচতে চাও।

বিমানের ওজন কমিয়ে দাও তোমরা, ক্যাপটেনের নিরুত্তাপ জবাব।

কি করে তা সম্ভব?

কেন সব কটা যাত্রীকে নামিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

অগত্যা আর অন্য কোনও উপায় না দেখে তাতেই রাজী হতে হলো দস্যুদের। মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে নিতে সার দিয়ে নেমে গেল যাত্রীরা। কেউ টেরই পেল না, ক্যাপটেন কি ভাবে বাঁচিয়ে দিলেন তাদের। টার্মিনাল বিল্ডিংএর দিকে যাবার সময় অনেকেই হাত নাড়ছিল আইজ্যাককে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

ক্লান্ত অবসন্ন বৈমানিক তখন মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনছেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, এভাবে আর কতক্ষণ? কে.এল.এম সংস্থাও প্রতি মুহূর্তে মিসিসিপির খবর রাখছিল। আইজ্যাকের শারীরিক কষ্টের কথা ভেবে কোম্পানি আর এক জন বৈমানিকের ব্যবস্থা করেছিল। তিনি মাল্টা থেকেই উঠতে চাইলেন। দস্যুরা এতে আপত্তি করল না। তাদের দরকার শুধু বিমানটা।

বৈমানিক পাল্টাবার প্রস্তাব শুনেই গা ঝাড়া দিয়ে বসলেন ক্যাপটেন আইজ্যাক রিস্যু। বেতারের মাধ্যমে তিনি জানালেন, মিসিসিপি আমার বড় প্রিয়। যতক্ষণ বাঁচি ওর সঙ্গছাড়া হতে চাই না, ওকে নিরাপদে রাখতে চাই, যতক্ষণ প্রাণ আছে।

সোমবারের ভোরে অমানুষিক পরিশ্রম করে মিসিসিপিকে নিয়ে মাল্টা ছাড়লেন তিনি। তবে ওঁর মন তখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত। যাত্রীদের দীর্ঘশ্বাস আর শুনতে হচ্ছে না। বিশাল মিসিসিপিতে এখন একজন যাত্রীও নেই। মাল্টা থেকে যাত্রা করার পর একে একে ইস্তামবুল, আঙ্কারা, বেইরুট, দামাস্কাস সব কটি জায়গায় নামার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন তিনি। বাগদাদ বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কুয়েত আর বাহরিনের অবস্থাও তাই। ততক্ষণে সওয়া লক্ষ লিটার তেলও শেষ। দুবাই বিমানবন্দরে আকুলবার্তা পাঠালেন ক্যাপটেন। নিমরাজী হয়ে নামতে দিল তারা।

তেলও দিল। কিন্তু দস্যুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে রাজী হলো না।

ইতিমধ্যে রাত ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারেই আবার যাত্রা করতে হলো, এবার এডেনের দিকে। কিন্তু এডেনে পৌঁছে ক্যাপটেন দেখলেন বিমানবন্দর বন্ধ। অন্ধকার আকাশে তিনঘণ্টা চক্কোর মারলেন তিনি। অনুমতি চাইলেন নামার। দস্যুরাও তাদের দাবি-দাওয়ার কথা শোনাল কিন্তু বিমানবন্দর যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কে শুনবে তাদের কথা!

এডেন ছেড়ে আইজ্যাক ফিরলেন দুবাই বিমানবন্দরে। বিমানটার চাকা বলতে তখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু সেই অবস্থাতেই ক্যাপটেন নামলেন সেখানে। ফের তেল নেওয়া হলো প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লিটার। ক্যাপটেন ডেকে পাঠালেন দস্যুদের। বললেন, এই শেষ। চাকার যে অবস্থা তাতে আর একবার মাত্র আমি উড়তে পারব। কিন্তু বিমানকে অক্ষত রেখে নামা বোধহয় সম্ভব হবে না। বিমানই যদি আর না উড়তে পারে তাহলে তোমরা কি করবে ভেবে দেখেছো?

নীরবে মাথা নিচু করে ক্যাপটেনের কথাগুলো শুনল দস্যুরা। তাঁর ওপর তাদের একটা বিশ্বাস এসে গিয়েছিল তাই বুঝতে পারল তিনি যা বলছেন তা কঠোর সত্য। ডিনামাইট বা পিস্তলের হাজার ভয় দেখালেও বিমান আর উড়ছে না। তাছাড়া ততক্ষণে তারাও হতাশ হয়ে পড়েছিল। অগত্যা দুবাইতেই আত্মসমর্পণ করল ওরা।

রেকর্ডবুকে নাম উঠলো ক্যাপটেন আইজ্যাক রিস্যুর। দীর্ঘ উনসত্তর ঘণ্টা বিমানদস্যুদের নিয়ে প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিনি এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে হাইজ্যাকিং আর কখনো ঘটেনি।

পৃথিবীর প্রথম বিমান ছিনতাই-এর ঘটনাটি ঘটেছিল পেরুতে। সেই থেকে এই চৌষট্টি বছরের মধ্যে অগুনতি বিমান ছিনতাই হয়ে গেছে। আগে দস্যুরা যাত্রী সেজে বিমানে উঠত। নিরাপত্তার কারণে চালু হলো সিকিউরিটি ব্যবস্থা। এখন দেহতল্লাশি হয় প্রতিটি যাত্রীর। এক্সরের মাধ্যমে দেখা হয় প্রতিটি লাগেজ। তবুও বিমানছিনতাইকারীদের আটকানো যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে সাবানের গোলাকে গ্রেনেড বলে, খেলনার পিস্তল দেখিয়ে তারা বৈমানিকদের পথ পাল্টাতে বাধ্য করেছে। ভীতসন্ত্রস্ত যাত্রী ও বৈমানিকরা তাদের ভাঁওতা ধরতে পারছে না।

গোড়ার দিকে হাইজ্যাকিং ঠেকাতে নানা উপায় ভাবা হয়েছিল। যেমন ঠিক হয়েছিল, ককপিটের পেছনেই থাকবে একটা চোরা দরজা। ককপিটে ঢুকতে গেলে ছিনতাইকারীদের ওখানে পা দিতেই হবে। আর পা পড়লেই খুলে যাবে ঐ চোরা দরজা। অসীমশূন্যে তলিয়ে যাবে দস্যুমশায়। কিন্তু অসুবিধে হলো দরজা খুললে বিমানের ভেতরকার কৃত্রিম বায়ুর চাপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এরপর ভাবা হয়েছিল ঘুমপাড়ানি গ্যাসের কথা। কিন্তু তাও ঠিক কাজে লাগল না। দেখা গেল অজ্ঞান হওয়ার আগের মুহূর্তেও দস্যুটি গুলি চালাবার ক্ষমতা রাখে। অথবা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিতে পারে। আবিষ্কার হলো অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের রশ্মি। ঐ রশ্মির আঘাতে জ্ঞান হারাবে যে কোনও মানুষ। ঠিক হলো রশ্মি ছোঁড়ার যন্ত্রটি থাকবে ককপিটের দুদিকের দেওয়ালে। দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলেই রশ্মি এসে আঘাত করবে মাথার দু পাশে। কিন্তু এ পদ্ধতিও কাজে এল না। কেননা একাধিক দস্যু থাকলে এ পন্থাতে কাজ হতো না। কাজ দিয়েছিল ওষুধ মেশানো খাবার এবং জলে। ঘুমপাড়ানি ওষুধ মেশানো খাদ্য কিংবা পানীয় দিয়ে ছিনতাইকারীদের কাবু করা গেছিল প্রথম প্রথম। পরে ওরা ধরে ফেলল এই কৌশল। মিস্ত্রির ছদ্মবেশে পুলিশ গিয়ে কাবু করেছিল এইসব দস্যুদের কয়েকটি ক্ষেত্রে। পরে তাই বিমানের ভেতর কাউকে আসতে দিলে, ওদের কথা মতো পরতে হতো সুইমিং কসটিউম। যাতে কোনো অস্ত্র না আনা যায়, তাই এই ব্যবস্থা।

ছিনতাই-এর সময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে যাঁকে বুদ্ধির চাল দিতে হয় তিনি ছিনতাই হওয়া বিমানটির বৈমানিক। উপস্থিত বুদ্ধি না থাকলে এ সময় অতগুলি লোকের প্রাণ বাঁচানোই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ছিনতাইকারীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হয় তখন তাঁকে। ওদের কথামতোই বিমান চালাতে হয়। তবে এক ফাঁকে ছিনতাই-এর খবর জানিয়ে দেন তিনি তাঁর কোম্পানিকে। ছিনতাই হয়েছে বুঝলেই তিনি সবার অলক্ষ্যে একটি আপতকালীন Transponder হাতের চাপে ছিদ্র করে দেন। মুহূর্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের র‍্যাডারে একটি সংকেত বারে বারে ফুটে উঠতে থাকে। খবর পাওয়া যায় অমুক বিমানটি ছিনতাই হয়েছে।

দস্যুটিকে বৈমানিক জানিয়ে দেন বিমানটির উচ্চতা এবং সঞ্চিত তেলের পরিমাপ। দস্যুটিকে এ দুটি ব্যাপারে ওয়াকিবহাল রাখার উদ্দেশ্য যাতে সে খেয়াল রাখে তেলের মাপ। তেল শেষ কিংবা বিমানটি নিরাপদ উচ্চতায় না থাকা মানেই তো দুর্ঘটনা। আর সে তো ছিনতাইকারীরও কাম্য নয়। বিমানটি যে ছিনতাই হয়েছে এ খবর যাত্রীদের দেবেন কি না সে সিদ্ধান্ত নেবার ভারও বৈমানিকের। সবশেষে তাঁকে নিশ্চিন্ত হতে হয়, তাঁর গন্তব্য ও পথের নিশানা সম্বন্ধে। এত রকমের কাজ সারতে সারতে তাঁকে কথা বলতে হয় আকাশদস্যুদের সঙ্গে। ছোট ছোট শব্দ, সামান্য অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি বোঝান তাঁকে বিশ্বাস করলে দস্যুরা ঠকবে না মোটেই। কিছু সাহসী বৈমানিক স্রেফ কথা বলেই দস্যুর হাতের অস্ত্র নিজের জিম্মাতে নিয়ে নিয়েছেন, এমন ঘটনাও বিরল নয়।

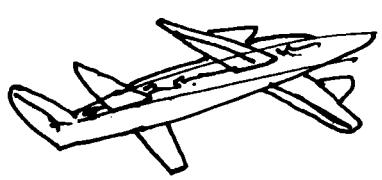

ছবি : সুফি

হাঁদা-ভোঁদার

চালাকির ফল

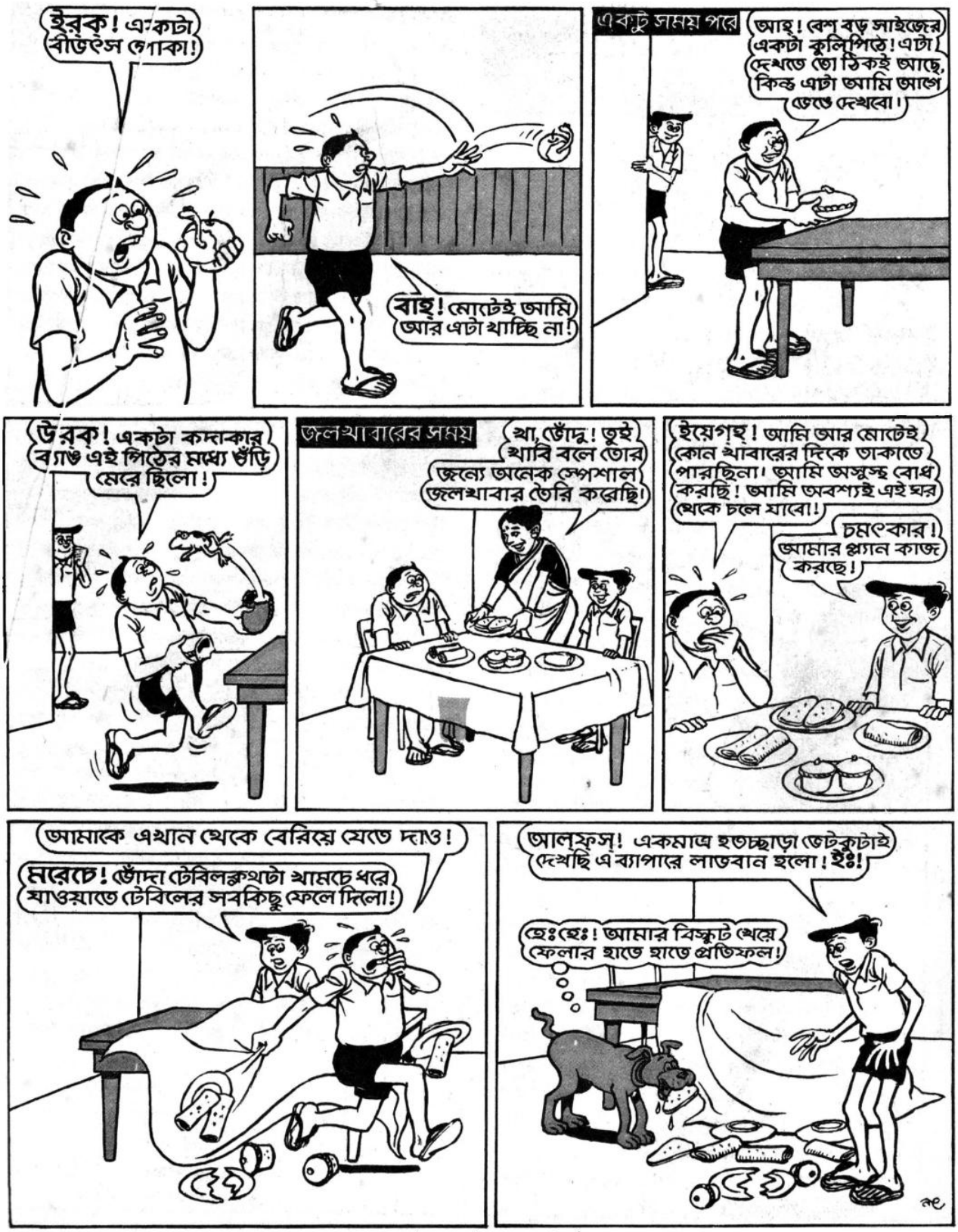
ইরক! একটা বীভৎস পোকা!
বাহ! মোটেই আমি আর এটা খাচ্ছি না!
এ কটু সময় পরে
আহ্! বেশ বড় সাইজের একটা কুলিপিঠে! এটা দেখতে তো ঠিকই আছে, কিন্তু এটা আমি আগে ভেঙে দেখবো!
উরক! একটা কদাকার ব্যাঙ এই পিঠের মধ্যে শুঁড় মেরে ছিলো!
জলখাবারের সময়
খা, তোঁদু! তুই খাবি বলে তোর জন্যে অনেক স্পেশাল জলখাবার তৈরি করেছি!
ইয়েগহ্! আমি আর মোটেই কোন খাবারের দিকে তাকাতে পারছিনা। আমি অসুস্থ বোধ করছি! আমি অবশ্যই এই ঘর থেকে চলে যাবো!
চমৎকার! আমার প্ল্যান কাজ করছে!
আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দাও!
মরেচে! তোঁদা টেবিলক্লথটা খামচে ধরে যাওয়াতে টেবিলের সবকিছু ফেলে দিলো!
আলফ্রস্! একমাত্র হতচ্ছাড়া ডেটকুটাই দেখছি এ ব্যাপারে লাভবান হলো! ইঃ!
হেঃহেঃ! আমার বিস্কুট খেয়ে ফেলার হাতে হাতে প্রতিফল!

ভবিষ্যতের ঠিকানা

ডি. এ. চন্দ্রন

মাধ্যমিক পাশ করে কী হবে!

মার্চ মাসে ঘটা করে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। চাট্টিখানি কথা, একসঙ্গে গোটা রাজ্য জুড়ে সারে চার লাখের ওপর পরীক্ষার্থী। একটা বিরাট কর্মকাণ্ড! এর মধ্যে আমাদের শুকতারার বন্ধুর সংখ্যাও কয়েক লাখ ছাড়িয়ে! ইতিমধ্যে আমাদের সম্পাদকের ঝুলিতে অনেকেই চিঠি পাঠিয়েছ, মাধ্যমিকের পর কি করবে না করবে সে বিষয়ে জানতে চেয়ে। অনেকে লিখেছ তোমরা ভবিষ্যতে দেশের কাজে লাগতে চাও, তাহলে কি নিয়ে পড়া উচিত? আবার কেউ লিখেছ ডাক্তারি এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হলে এখন থেকে কী করা উচিত ইত্যাদি। সত্যি, তোমাদের এই আগ্রহ দেখে দারুণ খুশি হয়েছি। তবে দুঃখু যে একটু আধটু-পাইনি তা নয়। গ্রাম ও শহরতলী থেকে যে তরুণ বন্ধুদের এক গুচ্ছ চিঠি এসেছে তাতে কেমন যেন হতাশার সুর! এই তো মুর্শিদাবাদের সঞ্জয় চিঠি লিখেছে ওর বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়, মাধ্যমিকের পর ওর পড়শোনা চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর। কি পড়লে রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে এটাই এখন ওর চিন্তা! হ্যাঁ, মাধ্যমিকের পর এমন অনেক কোর্স আছে যা পড়াশুনা করে রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে, চাকরি পেতেও সুবিধে হয়।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর অনেক ছেলেমেয়েই টাইপ শেখে—এটা ভাল লক্ষণ। মাধ্যমিক পাশের পর টাইপ বা শর্টহ্যান্ড শিখে টাইপিস্ট কিংবা স্টেনোগ্রাফার নিয়োগের পরীক্ষায় বসা যেতে পারে। টাইপ বা শর্টহ্যান্ড শিখে রাখলে ভবিষ্যতে যে কত কাজে আসে তার ইয়ত্তা নেই। ক্লাসে যেমন ডিকটেশন নিতে সুবিধে তেমনি টেক্সট বই থেকে নোট করতেও সুবিধে। তারপর সে সব যদি টাইপ মেশিন চালিয়ে পটাপট টাইপ করে ফেলা যায় তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি! ভাবী জীবনে উচ্চশিক্ষা, এমন কি কর্মজগতে টাইপ, শর্টহ্যান্ডের দারুণ ভূমিকা আছে। সময় নষ্ট না করে কমপিউটার প্রশিক্ষণ নিলেও অসুবিধে নেই। নিদেনপক্ষে ডাটা প্রোসেসিং শেখা যেতে পারে। আজকাল অনেক শহরতলীতে ছেলেমেয়েদের কমপিউটিং শেখানোর সুযোগ রয়েছে। ডাটা প্রোসেসিং, ডাটা পাঞ্চিং জানা থাকলে অনেক চাকরি পেতে সুবিধে হবে। তাছাড়া সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে টাইপিস্ট, শর্টহ্যান্ড জানা লোকের কদর আছে সব সময়। উপরন্তু টাইপ করতে জানলে কমপিউটিং শিখতে সুবিধে হয়। মিনিটে চল্লিশটা শব্দ শুদ্ধভাবে টাইপ করতে শিখলে বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করা যায়। এখন তো বাংলা ভাষায়ও টাইপি মেশিন বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অফিসে নিয়োগের জন্য প্রতি এক বছর অন্তর পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১৬১এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬) টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তাছাড়া ক্লার্কশিপ পরীক্ষা তো রয়েছেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে স্টেনো টাইপিস্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক প্রভৃতি পদে নিয়োগের পরীক্ষায়ও টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড জানা থাকলে ভাল হয়। স্টাফ সিলেকশন কমিশন (ইস্টার্ন রিজিওনাল অফিস—৫ এসপ্লানেড রো, কলকাতা-১, বিধানসভা ভবনের উল্টোদিকে) এইসব নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনা করে। কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হলেই এসব চাকরির পরীক্ষায় বসা যেতে পারে। রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে চাকরি বাগাতে পারলে মাইনেকড়ি ভাল, উপরন্তু নানা বাড়তি সুযোগ-সুবিধে!

তোমরা ভাবছ টাইপ শর্টহ্যান্ড শিখে চাকরি না ছাই হবে! ধরে নাও চাকরি হলো না—শেখা বিদ্যে কি মিথ্যে হয়ে যাবে? এই তো সোদপুরের বিকাশ টাইপিং শিখে কোনোদিন হতাশ হয়ে পড়েনি। সোদপুর বসু বিল্ডার্সের দোকানে বোসবাবুকে ধরে টাইপ মেশিন নিয়ে বসার জন্য এক চিলতে জায়গা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। বেকার জীবনে একটা মিনিট সে ফুরসত পেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে দেখো? সকাল ছটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত মেশিন একদম ফাঁকা নেই। আবার বিকেল চারটে থেকে রাত নটা। দিনে একশো দেড়শো টাকা আয় করেছে অনেক দিন। পুঁজি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড টাইপ মেশিন, নিজের হাতের দক্ষতা আর মিষ্টি হাসি। ওর গল্প এখানেই শেষ নয়, টাইপ করতে করতে সে একদিন নিজের অজান্তেই বনে গিয়েছিল দক্ষ টাইপিস্ট। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় এই কর্মদক্ষতাই এনে দিয়েছিল তার নিশ্চিত সাফল্য। এখন বিকাশ রাইটার্সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একজন দক্ষ টাইপিস্ট! এখনো কিন্তু অবসর সময়ে সেই বোসবাবুর দোকানে টাইপ মেশিনে টাইপ করতে সে ভোলেনি! টাইপ শিখেই সে নিজে নীড় বাঁধার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে, মা-বাবার মুখে হাসি ফুটিয়েছে, সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছে। এখন বিকাশবাবুর বাজারে অনেক দাম! দু-তিন বন্ধু মিলে টাইপ চেম্বার খুলে ভাল আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। সুযোগ-সুবিধে বুঝে চালানো যেতে পারে টাইপ-শর্টহ্যান্ড স্কুল। টাইপ মেশিন কেনা নিয়েও ঝামেলা নেই। কিস্তিতে পুরনো মেশিন কিনে এগিয়ে যাবার অনেক ঠিকানা আছে!

আরেকটা দারুণ কোর্সের কথা বলব। খুব মজা আছে শিখতে, আর যখন শেখা হয়ে যাবে তখন কাজও পাবে প্রচুর। শহরতলী, পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বত্র এখন বাড়িঘর তৈরির ধুম পড়ে গেছে। পুকুর, নালা, ডোবা, ধানের জমি, জঙ্গল কেটে সবাই এখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই করতে ব্যস্ত! সরকার, পৌর কর্তৃপক্ষ হিমশিম

খাচ্ছেন! পরিবেশবিজ্ঞানীরা প্রমাদ গুনছেন! এভাবে জঙ্গল সাফ করে, জলাশয় বুঁজিয়ে শুধু যদি কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করা হয় তাহলে অচিরে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। এমনিতেই খরা বেড়েছে দারুণভাবে, বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও নেই। মেঘের দেশ চেরাপুঞ্জিতে দেখে এলাম এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই! জলের জন্য কী হাহাকার! অথচ আমরা ভূগোলে পড়েছি, বছরে চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। প্রকৃতি কী দারুণভাবে পাল্টাচ্ছে! আসল কথা, ভারসাম্য বজায় রেখে তবেই তো নগরায়ন করতে হবে! পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখেও দিব্যি নানা আধুনিক সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে। আর এই করতে হবে প্ল্যানমাফিক। এই জন্যই দরকার পাশ-করা দক্ষ নকশাকারের। ইংরাজিতে যার পোশাকী নাম সার্ভেয়ার। এখন গ্রামে-গঞ্জে, শহরতলীতে সর্বত্র বাড়িঘরদোর করতে গেলেই ছুটতে হচ্ছে সার্ভেয়ারের কাছে। একটা আইনমাফিক নকশা চাই। সেটি বৈধভাবে অনুমোদন করিয়ে তবেই ঘরবাড়ি তৈরি করা যাবে, নতুবা নয়। তাছাড়া যাঁরা বিভিন্ন অফিসে, কাছারিতে চাকরি করেন তাঁরা গৃহঋণ নিয়ে বাড়ি করতে চান। তাঁদের গৃহঋণ মঞ্জুর করানোর জন্যও দরকার সার্ভেয়ারের সাহায্য। একটা খরচপাতির হিসেব করে দিতে হবে, এস্টিমেট ছাড়া ঋণ মঞ্জুর হবে কি ভাবে? এইসব কাজ হাতে-কলমে শিখতে হলে যেতে হবে ব্যান্ডেলের ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউটে। এটি তিন বছরের কোর্স। এই কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করতে হবে। বয়স হওয়া চাই ২১ বছরের মধ্যে। ভর্তির দরখাস্ত চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় অথবা ইনস্টিটিউটে গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে রাখলেই হলো। দরখাস্ত পাঠাতে হয়—প্রিন্সিপাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যান্ডেল, হুগলি এই ঠিকানায়। এখান থেকে পাশ করার পর চাকরির জন্য রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই। মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েত অফিসে সার্ভেয়ার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিলে কাজের অভাব হয় না। জমির মাপজোক, দালানবাড়ির নকশা তৈরির কাজে হামেশাই প্ল্যানারের কাছে ছুটতে হয়। চাকরি পেলে ভাল, না পেলেও নিজে থেকেই ভাল আয়ের সংস্থান করা সম্ভব। তবে সবসময়ই নিজেকে উদ্যোগী হতে হবে। সেই সিংহের গল্পের মতো—উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ, ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ। সিংহকেও ছুটোছুটি করে শিকার ধরে খেতে হয়। ইদানীং কিছু বেসরকারি সংস্থায়ও ড্রাফটসম্যানশিপ শেখানো হয়। সফলভাবে এই কোর্স শেষ করেও লাইসেনশিয়েট ড্রাফটসম্যান হওয়া যায়। সুতরাং নকশাকার বনে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে ক্ষতি কী? পেশাদারি এসব কোর্স শেষ করে আয়ের ব্যবস্থা পাকা করেও কিন্তু তোমার সাধারণ বিদ্যে বাড়িয়ে যেতে পারো। ঘরে বসে ডিগ্রিলাভের এখন অনেক সহজ উপায় আছে। পরের সংখ্যায় আরও সুযোগ নিয়ে আলোচনা করব।

পায়োমা ইন্ডাস্ট্রীজ পরিচালিত সারা বাংলা রসনা স্প্রেড মেকার নবীন শিল্পী প্রতিযোগিতা (বসে আঁকো) সম্প্রতি ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারাও উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত এলাকাটি যেন এক উৎসবের রূপ নেয়। সকাল ৯টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

'ক' বিভাগে অংশ নিয়েছিল ৮ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এবং 'খ' বিভাগে ছিল ৮ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বয়সের প্রতিযোগীরা। দুটি বিভাগেই আঁকার সময়সীমা ছিল এক ঘণ্টা।

প্রতিযোগিতার শেষে শুরু হয় গান। মাস্টার প্রসেনজিৎ দাস গান গেয়ে ২০০০ শ্রোতাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল।

পুরস্কার প্রদান করেন কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, কবি-সাহিত্যিক তারাপদ রায়, সমর নাগ, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও বি. এস. বরা। বিজেতাদের নগদ পুরস্কার ও রসনা সম্মানপত্র দেওয়া হয়।

পুরস্কার পেয়েছে—

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
প্রথম পুরস্কার	
১০০০·০০ সুরজিৎ দে	—অভিজিৎ ভঞ্জ
দ্বিতীয় পুরস্কার	
৭৫০·০০ অভিজিৎ দে	—সত্রাজিৎ চক্রবর্তী
তৃতীয় পুরস্কার	
৫০০·০০ সন্দীপ বিশ্বাস	—অরিত্র দত্ত
চতুর্থ পুরস্কার	
৩০০·০০ সৌমিতা ব্যানার্জী	—কৃশানু মুখার্জী
পঞ্চম পুরস্কার	
২০০·০০ সিম্পিতা সাহা	—নম্রতা সেনগুপ্ত

এ ছাড়া প্রতি বিভাগে ১০০ টাকা হিসাবে আরও ১০ জনকে রসনা সম্মানপত্রসহ সম্মানিত করা হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারও উপহার দেওয়া হয়। উপস্থিত অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের বিনামূল্যে রসনা পরিবেশন করা হয়। পায়োমা ইন্ডাস্ট্রিজ-এর আঞ্চলিক প্রধান চন্দ্রমৌলী ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এবং সকল সহকর্মীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বামীজীর ব্যবহারে ও কথাবার্তায় এমন এক সরলতা থাকত, যাতে অপরে তাঁকে ভালবেসে ফেলত আর বিশ্বাস করত তিনি যা বলছেন তা তিনি পালন করেন। তাই তাঁর ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেতে তাদের ধর্ম বিশ্বাস বা সামাজিক মর্যাদা কোনোটাতেই আঘাত লাগত না। স্বামীজীর প্রতিটি বক্তৃতাই নতুন ও তাজা। এমন ধীর কোমল শান্তভাবে সুরেলা কণ্ঠে এ কথা বলতেন যে এই প্রচণ্ড নির্ঘোষ শক্তি ও অগ্নিমুখ-শলাকার মতো লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করত আর সবাই ভাবত 'তুমিই নির্ধারিত পুরুষ হে ঈশ্বর দূত।' পাপবোধ দূর করে স্বামীজী খ্রীস্টান জগতের মুক্তিদাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বক্তৃতা ব্যুরোর সাহায্যে স্বামীজী মেডিসন, উইসকনসিন গিয়েছিলেন ২০ নভেম্বর। পরের দিন আরো বড় শহর মেনিয়াপোলিস-এর মিনেসটা গিয়েছিলেন। এখানে স্বামীজী তীব্র শীতের প্রকোপে পড়েছিলেন। সেখানে তখন তুষারপাত হচ্ছে, মিনিহাহা ঝর্ণাটা জমে বরফ। ব্যারোমিটারে পারদ—২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকদিন। ওই শীতে স্বামীজী বাইরে ঘুরে মজা করতেন। তিনি শীত ভালবাসতেন। গরম একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। ২৪ ও ২৬ নভেম্বর মেনিয়াপোলিস-এ বক্তৃতা করে ২৬ তারিখেই আইওয়া স্টেটসের ডেস মোইনেস শহরে পৌঁছলেন। এইভাবে দ্রুত ঘুরে ঘুরে ১৮৯৩-এর ডিসেম্বর ও ১৮৯৪-এর অর্ধেক জানুয়ারি পেরিয়ে গেল। জানুয়ারির বাকী সময়ে স্বামীজী মেমফিস, টেনিসী গেছেন। এখানে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বক্তৃতা দিয়েছেন।

জীবনের এই আমেরিকা পর্বে স্বামীজীকে অত্যন্ত কঠোর সাবধান হয়ে সাধারণ ভূমিতে থাকবার চেষ্টা করতে হতো। যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর মন ধ্যানের গভীরে ডুবে যাবে। অনেকবারই এমন হয়েছে দুমিনিট ফাঁক পেয়ে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন। ফলে গন্তব্যস্থল কখন পেরিয়ে গেছে খেয়াল নেই। পথের শেষপ্রান্ত থেকে ফিরে আসতে গিয়ে পুনরায় ধ্যান ও পুনরায় ভুল। তাই এক জায়গায় যেতে-আসতে অনেক অর্থ ব্যয় হতো, সময়ও নষ্ট হতো অনেক।

স্বামীজী যেমন চাইতেন আমেরিকানরা ভারতের ধর্মীয় জীবন পদ্ধতি জানুক, সে বিষয়ে সবরকমের চেষ্টা করতেন, তেমনি ভারতের জন্যে ধনার্জনের বিভিন্ন ব্যবস্থা জেনে নিতেও উৎসুক ছিলেন। এই হলো বিবেকানন্দ-সাধনা।

সেই সাধনাই আমেরিকার মানুষকে ভারতমুখী করে তুলেছিল। সে আজ কতোদিন আগের কথা। দেখতে দেখতে কেটে গেছে একটি শতাব্দী। কিন্তু ভারতীয় ধ্যান-ধারণা এবং ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর আমেরিকাবাসীর আকর্ষণ এবং কৌতূহল আজো এতোটুকুও কমেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের টানে আজো তাই তাঁরা ছুটে ছুটে আসেন ভারতে। কারণ, তাঁরা বুঝেছেন, স্বামী বিবেকানন্দই পথপ্রদর্শক। তাই তো আজ সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে বিবেকানন্দ-সাধনা।

(শেষ)।

ছবি : বিজন কর্মকার

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

শিক্ষা ✍ এলা নাগ

ডিসেম্বর মাস। আমাদের স্কুলে তখন বড়দিনের ছুটি চলছে। আমরা থাকি গড়বেতা অঞ্চলের একটি গ্রামে। গড়বেতার জঙ্গলে দল্‌মা পাহাড় থেকে হাতির দল এসেছে শোনা গেল। হাতির দলে আবার নাকি দুটো বাচ্চাও রয়েছে। দলে দলে লোক যাচ্ছে হাতি দেখতে। আমিও জেদ ধরলাম, হাতি দেখতে যাব। অনেক কষ্টে মা-বাবাকে রাজী করানো গেল। ঠিক হলো, পাশের বাড়ির কমলদার সঙ্গে আমি ও আমার বন্ধু বাবলা দুজনে যাব।

পরদিন দুপুরে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হাতি দেখতে। জঙ্গলের যে অঞ্চলে হাতির দল রয়েছে সেখানে পৌঁছে দেখলাম বেশ ভিড়। একটু ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা দাঁড়ালাম। জঙ্গলে জল খাবার জন্য যে বড় নালা রয়েছে, দেখলাম, তারই ওপারে হাতির দল তাদের মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত। একটা বাচ্চা ও বিশাল চেহারার এক দাঁতাল সমেত মোট ছটা হাতি দলে রয়েছে। ভিড়ের ভেতর থেকে তাদের লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে ইঁটের টুকরো, গাছের ডাল আর সঙ্গে নিয়ে আসা আনাজ। হাতিরা ভ্রূক্ষেপ করছে না। আপন মনে খেয়ে চলেছে। হঠাৎ একদল ছেলে পটকা জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিল দলের মধ্যে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল দাঁতালটা। তাই দেখে ভয়ে সকলেই ছুটে পালাতে শুরু করল। আমরাও পিছিয়ে এলাম কিছুটা। তাড়াহুড়োয় কেউ লক্ষ্য করলাম না একটা বছর তিনেকের বাচ্চা রয়ে গেছে সেখানে। প্রাণের ভয়ে সকলেই যখন ছুটছে, বাচ্চাটার মাও চলে এসেছে। ক্ষণিকের অসাবধানতায় বাচ্চাটা রয়ে গেছে। কিন্তু কে সাহস করে এগোবে তাকে ফিরিয়ে আনতে? দাঁতালটা যে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে! বাচ্চাটার কোনো বিকার নেই। সে হাতি দেখে মহা আনন্দে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে। বাচ্চাটার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমরা নিশ্চিত বাচ্চাটাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বাচ্চাটা তখন দাঁতালের থেকে হাত পাঁচেক দূরে। মনে হলো দাঁতালটা যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা মায়ের দিকে একবার দেখল, পরমূহূর্তে শুঁড় দিয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিল। সকলে ভাবলাম এবার বুঝি দাঁতাল উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সে পা পা করে এগিয়ে আসতে লাগল। সকলেই আবার ছুটতে শুরু করলাম। কিছুটা দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, কোনো প্রতিশোধ নয়, যেখানে বাচ্চাটার মা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, সেখানে তাকে নামিয়ে দিয়ে দাঁতাল ফিরে চলে যাচ্ছে। তারপর পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে সে আস্তে আস্তে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেল।

আমরা মানুষরা, নিজেদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে গর্ববোধ করি, বড়াই করি। আজ আমরা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মেতে উঠেছি। কিন্তু যাদের আমরা বুদ্ধিহীন পশু বলি, সেই পশুই আমাদের মহত্ত্বের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গেল।

নিতাইলাল সাহা স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

চিঠি ✍ জয়িতা পাল

যা চিঠি উড়ে যা
নীল আকাশের পথে,
সেই চিঠি পড়ে যেন
প্রিয় বন্ধুর হাতে।

দুত্তোর! কাঁহাতক আর অঙ্ক ভাল লাগে! আর ইংরাজি? সেটা তো আরও খটমটে। তার চেয়ে রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি। আজকে খিচুড়ি হয়েছে। সঙ্গে বেগুন ভাজা ও ডিম ভাজা। যদি একটু ডিম ভাজা বেশি থাকে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে গান ধরলাম আমি—

যখন তখন তোরা আমায় মারিস না,
হৃদয় দিয়ে মনটা আমার কাড়িস না,
রান্নাঘরে যাচ্ছি আমি, কেউ দেখে ফেলিস না।

ওমা! একি—পুষু-মেনি চাকুম চুকুম করে দুধ খাচ্ছে যে! ধর তো ওদের। যাঃ! পালিয়ে গেল বেটিরা। যা মোটা সর পড়েছিল হলুদ রঙের, ভেবেছিলাম সবাই ঘুমোলে বেশ করে..... তা আর কি করা যাবে। এখন মায়ের কাছে কানমলা খেতে হবে যদিও সরটা হতভাগী মেনিদের পেটে গেছে। নাঃ, আজ ভাগ্যটাই খারাপ। ডিম ভাজাও নেই। এখন কি করি? ভাবতে লাগলাম। যাই ঠাকুরঘরে। ঠাকুমা আজ প্যাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে। বরং ঠাকুর হয়ে....ওমা! রাক্ষুসে পিঁপড়েগুলো যে সব শেষ

করে দিয়েছে দেখছি। এইটুকু পেট, আর নোলা দেখ! অত বড় প্যাঁড়াটা সব শেষ করে দিয়েছে! এ তো বড্ড জ্বালা দেখছি—এখন কি করি? সারাটা দুপুর সবাই দেখ কেমন ঘুমোচ্ছে শুধু আমারই দুপুরে ঘুম আসে না। মায়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটলাম। এখন তো আবার ক্রিকেট খেলাও নেই। কি করি?

বুঝলে বন্ধু, আমি বড্ড একা। তোমার সঙ্গে এত কথা বললাম কেন জানো? আসলে তোমাকে তো আমি চিনি না তাই। তোমার ঠিকানা কি ভাবে পাই জানো? রবীন্দ্রসদনে যে ঠোঙাটায় ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম তাতে ছিল। ব্যস, বসে পড়লাম চিঠি লিখতে। রাগ কোরো না কিন্তু। উত্তর দেবে তো? ইতি—

পুপু

কিছুদিন বাদে উত্তর এল।

প্রিয় বন্ধু পুপু,

শীতকালে খিচুড়ি খেতে কি মজা বল? আমিও খিচুড়ি খাই ডিম ভাজা দিয়ে। জানি না, আমার নাম ঠিকানা ঝালমুড়ির ঠোঙা হয়ে তোমাদের রবীন্দ্রসদনে গেল কি করে! আমার সঙ্গে তোমার ভীষণ মিল আছে। আমিও সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে যাই। তবে আমি তোমার মেনিদের মতো সর খাই না। আমূল স্প্রে খাই। আর চা বানাতে গিয়ে মা না পেলে কানমলা নয়, গাঁট্টা খাই। ইতি—

তোমার বন্ধু
পোকন

ছবি: সুচি

এ ছাড়া যাঁদের লেখা ভালো হয়েছেঃ

সুস্মিতা নাথ (সোনালী পার্ক, গড়িয়া)॥ সুদীপ্ত প্রামাণিক (মাকলা গভর্নমেন্ট কলোনি, হুগলী)॥ অরুণাভ দাস (বাজারপাড়া, মালদহ)॥ গীতিকা পণ্ডা (কল্যাচক, মেদিনীপুর)॥ অতনু মুখার্জী (বেলেঘাটা, কলকাতা-১০)॥ কবিতা চৌধুরী (দুর্গাপুর, বর্ধমান)॥ শ্বেতা গাঙ্গুলী (দফরপুর, হাওড়া)॥ অন্তরা ভৌমিক (নৈহাটি, উঃ চব্বিশ পরগনা)॥ কুশলকুমার বাগচী (অযোধ্যানগর, মুর্শিদাবাদ)॥ সুজিত বসাক (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)॥

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক এবং বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই বিশেষ পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এই মাসের পুরস্কার প্রাপকরাঃ

এলা নাগ, জয়িতা পাল, সুস্মিতা নাথ, সুদীপ্ত প্রামাণিক ও অরুণাভ দাস।

ঘোষণা

আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের কর্ণধার সঞ্জয় সাহা তাঁর প্রয়াত পিতামহ নিতাইলাল সাহার স্মরণে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা মৌলিক লেখা পাঠাতে পারেন।

নিতাইলাল সাহা
মৃত্যুঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

বিষয়বস্তুঃ
এই ভরা শ্রাবণে

প্রথম পুরস্কারঃ ১০০ টাকা॥ দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ৫০ টাকা

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ আষাঢ়। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হবে।

সৌজন্যেঃ আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) গড়িয়াহাট জংশন
১৬১ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০০১৯

সেজদাদু এখন বিশ্বকাপ নিয়েই ব্যস্ত

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সেজদাদুর মেজাজ এখন বোঝা ভার। কখনো মনে হয় ভীষণ রেগে আছেন, কখনো আবার খুব খুশি। বিল্টু-মন্টু ঠিক থৈ পায় না। তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কপিলদেবের ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া, রনজি ফাইনালে বোম্বাই-এর কাছে বাংলার হেরে যাওয়া সেজদাদুর মোটেই ভালো লাগেনি। সেজদাদুর মতে, কপিল দলে থাকলেই যে ভারতীয় দলের শক্তি বাড়ে, গ্ল্যামার বাড়ে, প্রতিপক্ষ দলের ওপর খানিকটা চাপ সৃষ্টি করা যায়—ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তারা এই সরল সত্যটাই বুঝলেন না। আর বাংলার অধিনায়ক যদি আর একটু বুদ্ধিমান হতেন তাহলে রনজি ফাইনালে বাংলাকে হারতে হতো না। এর ওপর আবার ইস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের হারও আছে। সব মিলিয়ে সেজদাদু যেমন রেগে আছেন, তেমনি বিরক্ত হয়ে আছেন। ওঁর যতো রাগ সব গিয়ে পড়ে বিল্টু-মন্টুর ওপর।

বিল্টু-মন্টুও আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে। ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা তোলে। অমনি সেজদাদু খুশি হয়ে ওঠেন। আসলে বিশ্বকাপ এসে পড়েছে। মাঝে আর মাত্তর একটা মাস। সেজদাদু এখন খেলার সময় হিসেব করছেন। রোজ টিভিতে খেলা দেখা হবে তো! কথায় কথায় সেজদাদু বলেন, কি তোরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে মাথা খারাপ করিস? বিশ্বকাপের খেলাগুলো দ্যাখ তারপর বুঝবি ওগুলো কোনো খেলাই নয়।

বিল্টু-মন্টুরা দেখেছে, ফাল্গুন মাসের শুকতারাটা সেজদাদু খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। ওতে বিশ্বকাপের খেলার সূচি আছে। শুকতারাটা পড়েন আর বলেন, কবে কোন খেলাটা হবে। তারপর সময়ের হিসেব করতে বসে যান। বিল্টু-মন্টুরা জানে, বিশ্বকাপের খেলার সময় সারা রাত টিভি চলবে। সবাই মিলে খেলা দেখা যাবে। মাঝে ওদের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, শুনেছিলো, মারাদোনা

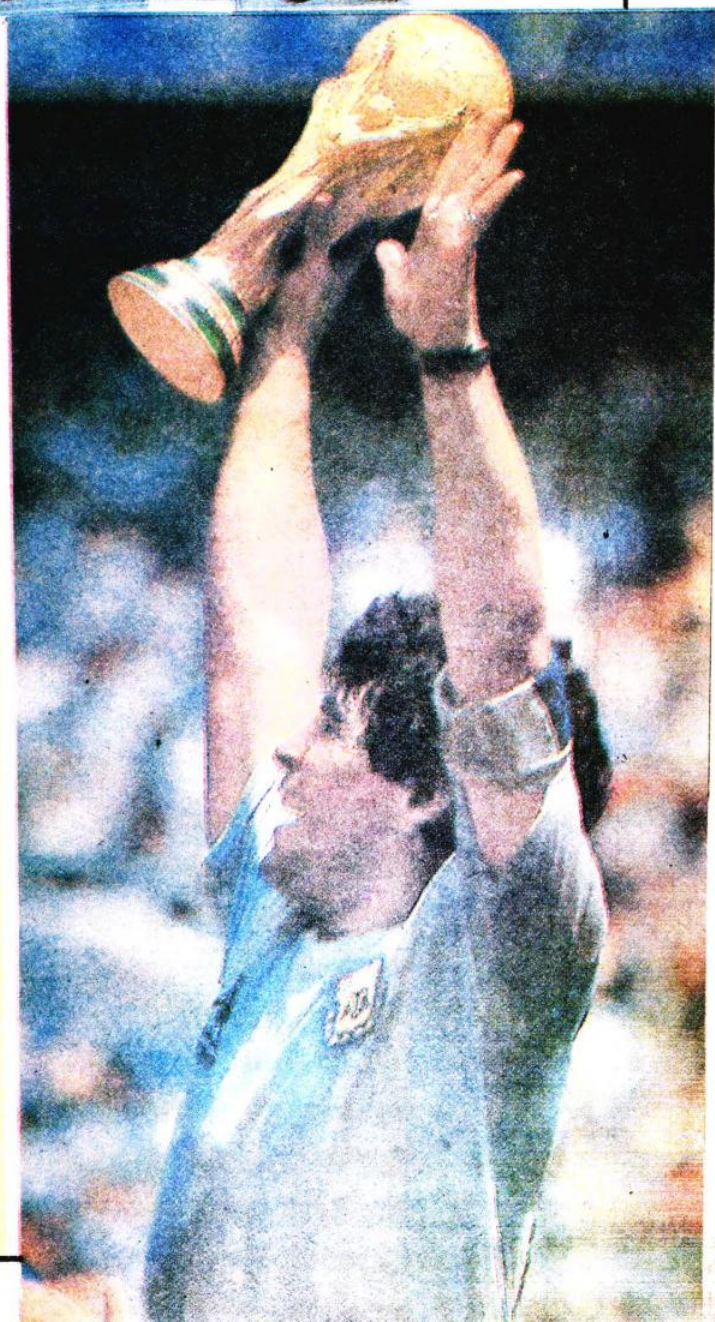

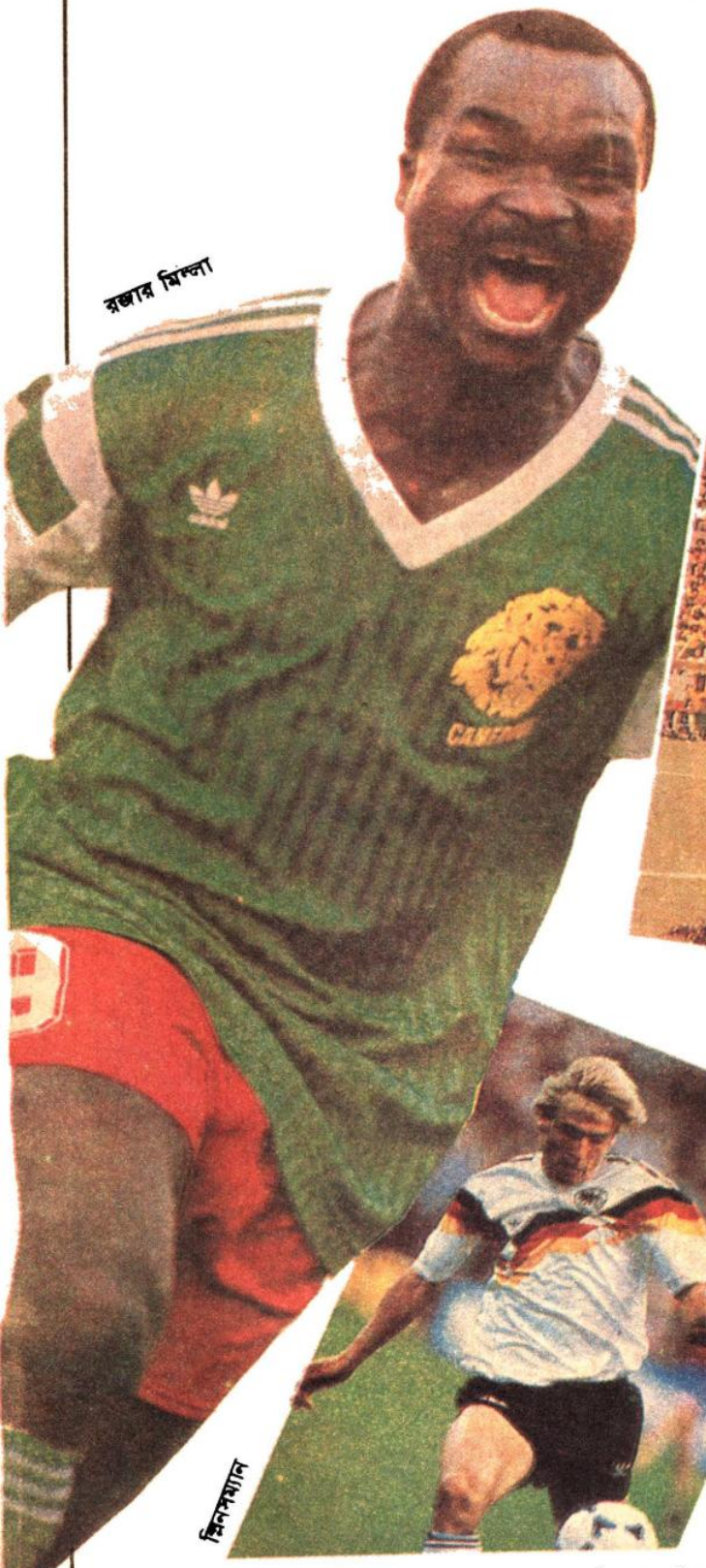

রজার মিল্লা

ক্লিনস্ম্যান

এবারের বিশ্বকাপে খেলবেন না। কপিলদেব না খেললে ভারতীয় দল যেমন কানা হয়ে যায় তেমনি মারাদোনাহীন আর্জেনটিনা। তা মেয়ে ডালমার বড় ইচ্ছে তার বাবা বিশ্বকাপে খেলুন। মেয়ের ইচ্ছে তো মারাদোনার কাছে নির্দেশ। তাই মারাদোনা বিশ্বকাপে খেলবেন বলে ঠিক করেছেন। বলের রাজা পেলে অবশ্য বলেছেন, মারাদোনার আর খেলা উচিত নয়। পাকাপাকিভাবে বুট তুলে রাখাই উচিত। মারাদোনা তা হয়তো রাখবেন। তবে এবারের বিশ্বকাপের পরে যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবেন মারাদোনা।

ভারতীয় ক্রিকেট দল থেকে কপিলদেবের বিদায়-ঘন্টা বেজে উঠেছে। টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়ে কপিল এখন বিশ্বসেরা। তাঁর খেলার ধার নিশ্চয়ই কিছুটা কমেছে। কিন্তু দল থেকে বাদ পড়ার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ অবশ্য বলেছেন, কপিলকে মোটেই বাদ দেওয়া হয়নি। ওঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলেছে তাকে ঠাণ্ডা করতেই কি বিশ্বনাথ ঐ কথা বলেছেন? বিশ্বনাথ বলেছেন, দল গড়ার আগের দিন সকালে কপিল তাঁকে ফোন করে বলেছিলেন, তিনি বিশ্রাম চান। তবে দেশের প্রয়োজন হলে তিনি খেলতে রাজী। তাই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়নি।

বিশ্বনাথের এই কথা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কপিলকে ভারতের দরকার নেই। আশঙ্কার বিষয় এইটাই। তবে দেশ জুড়ে যে প্রতিবাদের ঝড় বইছে তাতে মনে হয় আসছে শীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঝট করে কপিলকে বাদ দিতে পারবেন না নির্বাচকরা। কপিলকেও অবশ্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। ভালো খেলে ভারতীয় দলে নিজের স্থান কপিলকেই পাকা করে নিতে হবে। কপিল তা পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ক'মাস বিশ্রাম নিয়ে কপিল

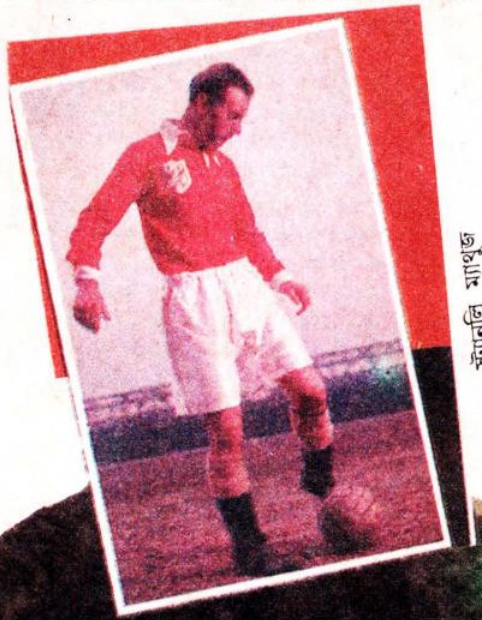

স্ট্যানলি ম্যাথুজ

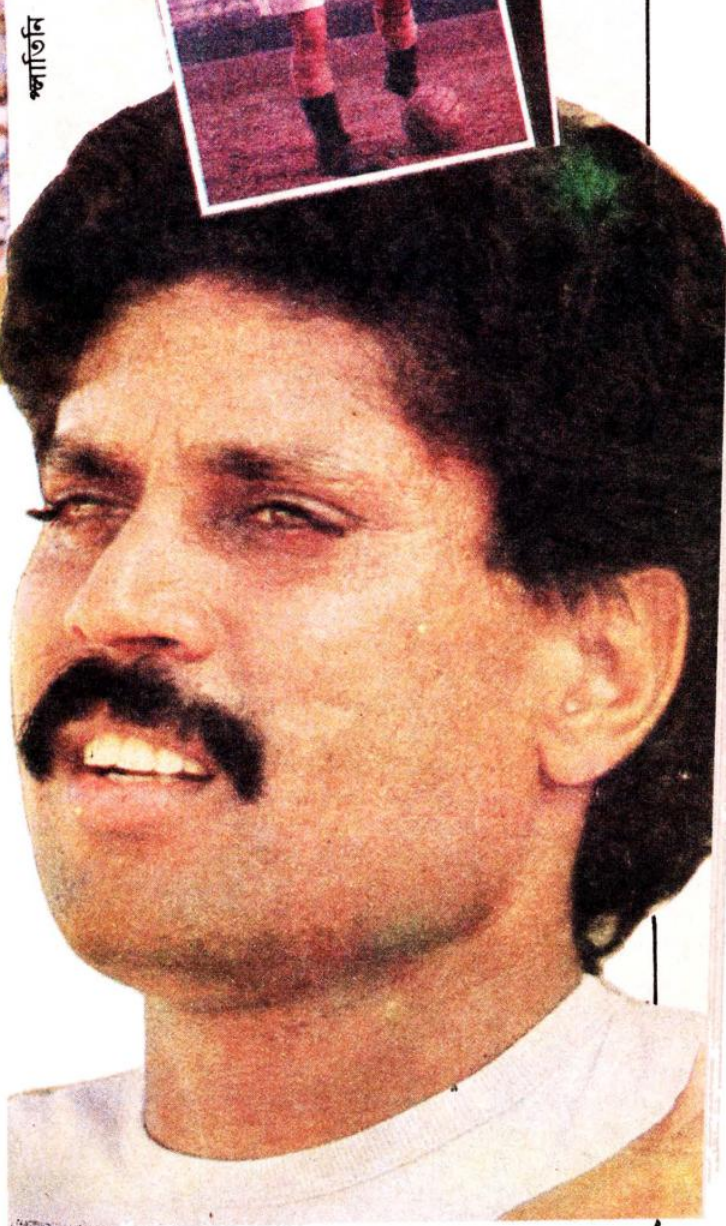

প্লাতিনি

নিশ্চয়ই পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। কাঁধের ব্যথা কমে যাবে এবং কপিল আবার দুরন্ত হয়ে ভারতীয় দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ নির্বাচকদের দিতে পারবেন। ভারতের কোটি কোটি ক্রিকেটরসিক কিন্তু মনেপ্রাণে তাই চান। তাঁরা চান ফর্মের তুঙ্গে থাকতে থাকতেই কপিল যেন ক্রিকেট মাঠকে আলবিদা জানান। শুধু বিন্টু-মন্টুরাই নয়—সেজদাদুও তাই চান। দেখা যাক কপিলদেব সকলের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেন কিনা।

তবে এখন বিশ্বকাপ ফুটবল আসছে। এবার ধীরে ধীরে খেলাধূলার জগৎ দখল করে নেবে বিশ্বকাপ। চাপা পড়ে যাবে ক্রিকেট। উইম্বলডন আর অন্যবারের মতো সাড়া জাগাবে না। ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সকলেই মেতে উঠবে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে।

গল্প নয় সত্যি

নীল ম্যাকবেনের রেকর্ড কেউ কি কোনোদিন ভাঙতে পারবেন? মনে তো হয় না। নীল সবচেয়ে বেশি বয়সে ফুটবল খেলার রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ ৫২ বছর ৪ মাস বয়সে তিনি ইংলন্ডের তৃতীয় ডিভিসনে নিউ ব্রাইটনের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন হার্টলপুল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। এর পরেই আসবে বব সুটের নাম। বব ছিলেন ইংলন্ডের হ্যালিফাক্সের খেলোয়াড়। ৫০ বছর ৯ মাস বয়সে তিনি ডারলিংটনের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন।

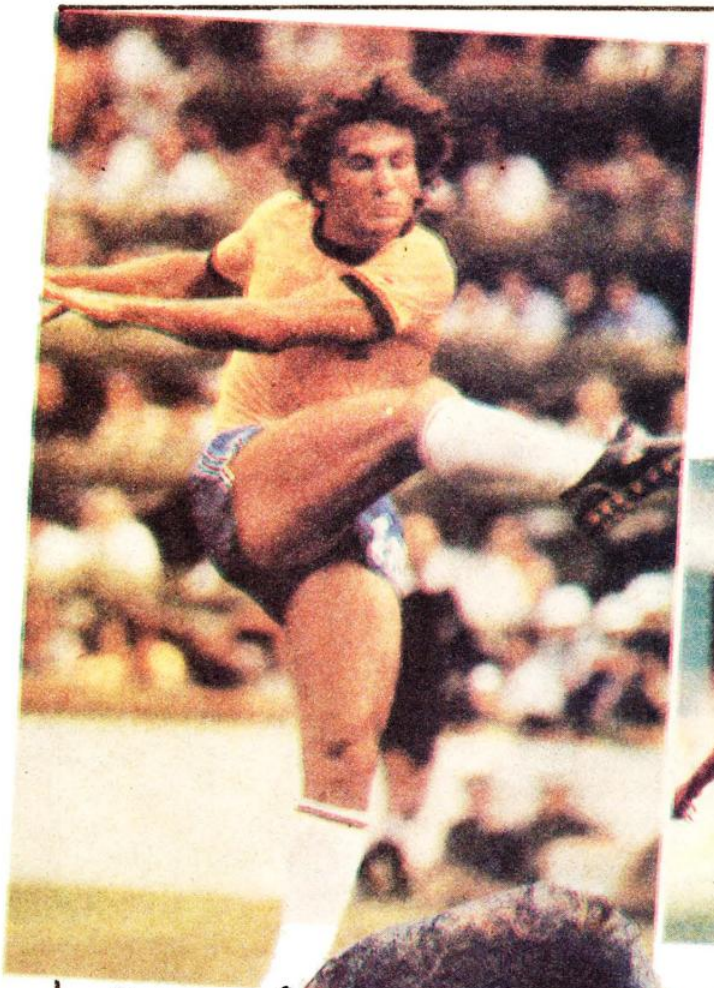

জিকো

বিশ্বজোড়া নামকরা খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সে ফুটবল খেলতে নামার রেকর্ড স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজের। ১৯৬৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ম্যাথুজ প্রথম ডিভিসন ফুটবলে তাঁর জীবনের শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন। সেদিন ম্যাথুজের বয়স ছিলো ৫০ বছর ৫ দিন। সেদিন ম্যাথুজ স্টোকসিটির হয়ে ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন। সেটি ছিলো ম্যাথুজের জীবনের শেষ এবং ৭০১তম লীগ ম্যাচ। এই বছরই তিনি নাইটহুড পান। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি টানা ফুটবল খেলেছেন। ইংলন্ডের পক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ৫০টিরও বেশি। তাঁকে ফুটবলের যাদুকর বলা হয়। বিশ্বের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় ম্যাথুজের নাম একেবারে ওপরের দিকেই থাকবে। বিশ্বকাপ আসছে, এখন আবার সকলের মুখে মুখে ঘুরবে ফুটবলের যাদুকর স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজের নাম।

মাকানাকি

বাজিও

পঞ্চাশ সালের সেই ম্যাচঃ বিশ্বকাপের সেরা অঘটন

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আমেরিকায় হবে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের টুকটাক কাজ। একটা বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা জোর জমে উঠেছে। উদ্যোক্তা দেশ আমেরিকা প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে পারবে তো? আমেরিকার গ্রুপে আছে রোমানিয়া, কলোম্বিয়া আর সুইজারল্যান্ড। দলগত শক্তির দিক দিয়ে তিনটি দেশই আমেরিকাকে টেক্কা দিতে পারে। তবে কি আমেরিকা এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে পারবে না? তা যদি তারা না পারে তাহলে বিশ্বকাপে নতুন নজির সৃষ্টি হবে এবার। কারণ এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটি উদ্যোক্তা দেশ বিশ্বকাপের অন্তত

এন্টন

ভিয়ালি

জাভারভ

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে। দেশের মাঠে খেলে কোনো উদ্যোক্তা দেশকেই প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়নি। এবার কি হবে ?

আমেরিকা অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভালো খেলার। সুইজারল্যান্ড, কলোম্বিয়া, রোমানিয়ার সঙ্গে লড়ার জন্যে তারা তৈরি। তবু একটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। তবে অঘটন ঘটাতে আমেরিকা ওস্তাদ। আমেরিকা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অঘটনটি ঘটিয়েছে ১৯৫০ সালে। সেদিন ছিলো জুন মাসের ২৯ তারিখ। স্থান ব্রাজিলের এক অখ্যাত জনপদ বেলো হোরাইজোনটে। আমেরিকার সঙ্গে খেলতে নেমেছিলো স্যার আলফ রামসের ইংলন্ড দল। এই খেলায় ইংলন্ড কতো গোলে জেতে সেইটাই ছিলো সকলের গবেষণার বিষয়। তাই মাঠে সেদিন তেমন দর্শক হয়নি। সাংবাদিকরাও তেমনভাবে ভিড় জমাননি। কারণ আমেরিকা সেবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে এসেছে। আর ইংলন্ড ব্রাজিল এসেছে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। তাই সকলেই খেলাটাকে নেহাতই নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন।

খুশি মনে মাঠে গিয়ে সাজঘরে ঢুকলেন ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা। পরমুহূর্তে পড়িমরি করে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এলেন। ইয়া বড় বড় ইঁদুর সাজঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্যোক্তারা মাঠের কাছের একটি ক্লাবে নিয়ে গেলেন ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের। সেখানে ড্রেস করে মাঠে এসে খেলতে নামলেন, অত্যন্ত হাল্কা মেজাজে। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন আমেরিকাকে গুনে গুনে গোল দেবেন। তাঁদের ঠোঁটের কোণে লেগে ছিলো তাচ্ছিল্যের হাসি।

সেই হাসি মিলিয়ে যেতে কিন্তু বেশি সময় লাগলো না। মার্কিন খেলোয়াড়রা বীরবিক্রমে খেলতে লাগলেন শক্তিধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। টম ফিনি আর ম্যানিয়মের শট বারে লেগে ফিরে এলো। ইংলন্ড চেপে খেলছিলো ঠিকই। সেই চাপের মুখে আচমকা গোল করে বসলো আমেরিকা। তখন খেলা মিনিট ৩৭ গড়িয়েছে। মাঠে হাজির ব্রাজিলের মানুষ সেদিন আমেরিকার সাপোর্টার। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন আমেরিকার লেফট হাফ বাহর বলটা ইংলন্ডের গোলের মুখে উঁচু করে তুলে দিলেন। গোলরক্ষক উইলিয়ামস বলটা ধরার জন্যে এগিয়ে এলেন। হঠাৎ দেখা গেলো গেটজেনস লাফিয়ে উঠেছেন। উইলিয়ামস বলটা ধরার আগেই তিনি বলে মাথা ছুঁইয়ে দিলেন। ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন, বলটা উইলিয়ামসের নাগাল এড়িয়ে জড়িয়ে গেছে জালে। ব্যাপারটা কি হলো—প্রথমে ব্রাজিলের দর্শকরা বুঝতে পারেননি। কিন্তু তারপর তাঁরা শত্রুনিপাতের আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। ঐ এক গোলই ইংলন্ডের ভাগ্য নির্ধারিত করে দিলো। আমেরিকার কাছে এক গোলে হেরে যাওয়ায় ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা এতোই ভেঙে পড়েছিলেন যে তাঁরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। এর পর গ্রুপের শেষ খেলায় ফ্রান্সের কাছে হেরে তাঁদের দেশে ফিরে যেতে হয়েছিলো। আর বিশ্বকাপের সেরা অঘটনগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছিলো আমেরিকা ইংলন্ডের সেই খেলাটি।

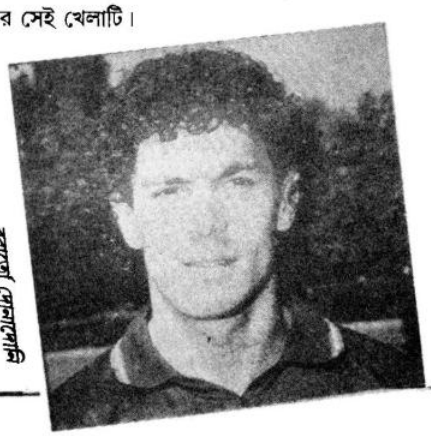

ফ্রাঙ্কো বারেসি

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

১) একদিনের ক্রিকেটে কপিলের হ্যাটট্রিকটির বিশেষত্ব কি ?
২) একদিনের ক্রিকেটে সব থেকে কম বলে সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কে গড়েছেন ?
৩) কপিলদেব ছাড়া বিশ্ব ক্রিকেটে আর মাত্র একজন বোলারই দুবার টেস্ট খেলায় প্রথম বলেই উইকেট দখল করেছেন। তাঁর নাম কি ?
৪) একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাত্র একজন খেলোয়াড়ই দু দু'বার হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি কোন দেশের খেলোয়াড় ? নাম কি ?
৫) টেস্ট ক্রিকেটে ভারতকে প্রথম জয় এনে দেন কোন অধিনায়ক ?
৬) ন্যাটা বোলার হিসেবে কে টেস্ট ক্রিকেটে সবথেকে বেশি উইকেট দখল করেছেন ?
৭) কোন মহিলা ভারতকে এশিয় ক্রীড়া থেকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন ? কোন সালে—কোন বিভাগে ?
৮) কোন ব্যাটসম্যান প্রথম অবস্ট্রাকটিং দ্য উইকেট অর্থাৎ বাধা সৃষ্টি করার জন্যে আউট হয়েছেন ?
৯) এখন পেন্টাথলনের প্রতিযোগীদের কোন কোন বিভাগে অংশ নিতে হয় ?
১০) উইম্বলডনের দীর্ঘতম ম্যাচ কোনটি ? কোন সালে কে কে খেলেছিলেন ? কতো গেম খেলা হয়েছিলো ?
১১) ১৯৯২ সালের ওলিম্পিকে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবথেকে ধনী কে ছিলেন ? বছরে তাঁর রোজগার কতো ?
১২) বিশ্বকাপ ফুটবলে সব থেকে বেশি দর্শকের উপস্থিতি ছিলো কোন ম্যাচে ? খেলা কোন মাঠে হয়েছিলো ? কতো দর্শক সেই খেলাটি দেখতে এসেছিলেন ?

উত্তর ঃ

১) কপিল হ্যাটট্রিকটি দু-ওভারে করেছেন। একটি ওভারের শেষ বলে তিনি মহানামাকে আউট করেন। পরের ওভারের প্রথম দুটি বলে তিনি পরপর জয়সূর্য আর রুমেশ রত্নায়েকেকে আউট করে হ্যাটট্রিকটি করেছিলেন।
২) ভারতের মহম্মদ আজহারউদ্দিন—৬২ বলে।
৩) ইংলন্ডের জিওফ আরনল্ড।
৪) পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রাম।
৫) বিজয় হাজারে।
৬) ইংলন্ডের ডেরেক আন্ডারউড—২৯৭টি উইকেট।
৭) কমলজিৎ সান্ধু। ১৯৭০ সালে। তিনি ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন।
৮) ইংলন্ডের লেন হাটন।
৯) ইকুইসট্রিয়ান, ফেনসিং, সুইমিং, শুটিং আর ক্রস কান্ট্রি দৌড়।
১০) ১৯৬৯ সালে, পাঞ্চো গঞ্জালেস ১১২টি গেম খেলে তবেই হারাতে পেরেছিলেন চার্লি প্যাসকারেলকে।
১১) আমেরিকার বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডন। বছরে তাঁর রোজগার ২৫ মিলিয়ন ডলার।
১২) ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি দেখতে দু লক্ষ দর্শক ভরিয়ে দিয়েছিলেন রিওডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়াম। খেলাটি হয়েছিলো ব্রাজিলের সঙ্গে উরুগুয়ের।

উক্তি

বিশ্রাম দেবার কথাটা মানতে পারছি না। সকলেই জানেন, আগামী ক'মাস কোনো খেলা নেই। কপিল তো বিশ্রাম পাবেই। এখন দু-তিনটি ম্যাচ খেললে ওর আর কতো বেশি ক্ষতি হতো। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, কপিলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কপিল দেশের গর্ব। তার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জার।

—সুনীল গাভাসকার

(সম্প্রতি একটি লেখায়)

দল গড়ার আগের দিন সকালে কপিল আমায় ফোন করে বলেছিলো, ও পুরোপুরি সুস্থ নয়। তবে দেশের জন্য দরকার হলে খেলতে রাজী।

কপিলের বিশ্রামের দরকার ছিলো বেশি। তাই ওকে আমরা বিশ্রাম দিয়েছি।

—গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

(সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে)

কপিলকে ভারতীয় দলে ফিরতে হলে আবার তাকে হয়তো যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এর চেয়ে বড় জাতীয় লজ্জার

বিষয় আর কি হতে পারে?

—মনসুর আলি পতৌদি

(কপিলকে বাদ দেওয়া নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে)

বিশ্বের সর্বাধিক উইকেট দখলকারী খেলোয়াড়টির (টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে) সঙ্গে যে ব্যবহার করা হলো তা একমাত্র ভারতেই সম্ভব।

—বিষেণ সিং বেদী

(সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে)

কপিলের বলে এখনো যে ধার, ব্যাটে এখনো যত রান, ফিল্ডিংএ এখনো যে দক্ষতা—ভারতীয় দলের ক'জন খেলোয়াড়ের তা আছে?

—মদনলাল

(সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে)

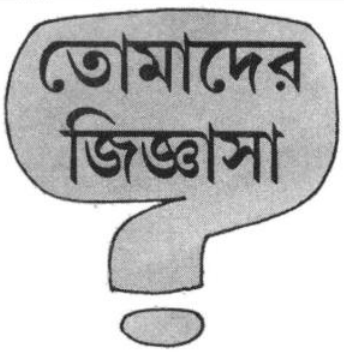

রুপাই পাল ও সুমন্ত পাল (পালসুইট, কাতরাসগড়, ধানবাদ)

প্রশ্ন ঃ মোহনবাগান কি সত্যিই জাতীয় ক্লাব?

উত্তর ঃ হ্যাঁ!

দেবব্রত মাইতি (দামোদরপুর, মেদিনীপুর ৭২১ ৪৪৬)

উত্তর ঃ তুমি সুইজারল্যান্ডের কনসোলেট বা দিল্লির হাইকমিশনারের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। ওঁরাই তোমায় সাহায্য করবেন।

উজ্জ্বল কুমার দত্ত ও হেমন্ত দত্ত (মাঠপাড়া, আদরা, পুরুলিয়া)

প্রশ্ন ঃ বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আসর কোথায় বসেছিলো?

উত্তর ঃ উরুগুয়েতে ১৯৩০ সালে।

রূপা (৯ জি বি লেন, হাওড়া)

উত্তর ঃ চেতন শর্মার রেস্তোরাঁ চ্যাপলিন সিনেমার উল্টোদিকের গলির মধ্যে।

বিপ্লব মণ্ডল (হুগলি ৭১২৬১৪)

উত্তর ঃ শচীনকে নিয়ে শীঘ্রই লেখা হবে—তাতে ওঁর পুরো ঠিকানা দেওয়া হবে।

অনাবিল পালিত (১৪, বাবুতলা রোড, দমদম, নাগেরবাজার)

উত্তর ঃ ডবল ফিগার হলো দশ বা তার বেশি রান। উইকেটের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে যাওয়াকে রানিং বিটুইন দ্য উইকেট বলে।

সৌম্যজ্যোতি সাহা (নবদ্বীপ, নদীয়া)

উত্তর ঃ ধন্যবাদ। কপিলের নামটা বাদ চলে গিয়েছিলো। কপিলও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ টেস্টে ৮৩ রানে ৯টি উইকেট দখল করেছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ দে (কোন্নগর, হুগলি)

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রথম এশিয় ক্রীড়ার আসর দিল্লিতেই বসেছিলো।

সত্যজিৎ রায় (গ্রাম তিল্লা, হুগলি ৭১২১৪৯)

উত্তর ঃ বিনোদ কাম্বলির বড় রঙিন ছবি নিশ্চয়ই ছাপা হবে।

অনামিকা মুখার্জি (রানীগঞ্জ, বর্ধমান)

উত্তর ঃ আজহারউদ্দিনের বাড়ির ঠিকানা তো দেওয়া যাবে না। তবে ওঁকে হায়দরাবাদে অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার ঠিকানায় চিঠি দিলেই উনি পাবেন।

গোলের পেছনে ছোটেন ইতালির সিলাচ্চি

সুমন ভট্টাচার্য

বাবা-মা দোমিনিকো আর জিওভান্না গিয়েছিলেন সপ্তাহের শেষটা ছুটি কাটাতে বাইরে। হঠাৎই খবর পেলেন ছেলে বিশ্বকাপে গোল করে দেশকে জিতিয়েছে। শহরে যখন তাঁরা ফিরলেন তখন আর হাঁটতে হলো না, শহরবাসীরা কাঁধে করেই তাঁদের পৌঁছে দিল বাড়িতে। গোটা পালেরমো পাগল হয়ে গেছে তাদের প্রিয় টোটোর জন্য।

টোটো ওরফে সালভাদোর সিলাচ্চি খ্যাতির শীর্ষে উঠতে শুরু করেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে। কার্নিভালের পরিবর্তে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে এসেই গোল করে দলে নিজের জায়গাটা স্থায়ী করে নেন সিলাচ্চি। তার পরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। প্রতিটি ম্যাচেই ইতালীর জয়ের কাণ্ডারী ছিলেন মূলত এই বেঁটে-খাটো চেহারার তরুণ। শুধুমাত্র বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার শিরোপা পাওয়াই নয়, রাতারাতি গোটাদেশের কাছে তারকা বনে গিয়েছিলেন সিলাচ্চি। স্ত্রী রিটা তখন সদ্যজাত দ্বিতীয় সন্তানটিকে নিয়ে হাসপাতালে। সিলাচ্চি তাকেই উৎসর্গ করেছিলেন টুর্নামেন্টে তাঁর শেষ এবং ষষ্ঠ গোলটি। অবশ্য এই গোলটির জন্য সিলাচ্চি কৃতজ্ঞ ইতালি দলে এবং ক্লাব জুভেন্টাসে তাঁর সতীর্থ রবার্তো বাজ্জোর কাছে। কারণ বাজ্জোকে করা ফাউল থেকে সিলাচ্চি টপকে গিয়েছিলেন স্কুরাভির পাঁচ গোলের প্রাচীরকে। ২৯ নম্বর জার্সি গায়ে বিশ্বকাপ কাঁপাবেন সিলাচ্চি এটা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেননি, একমাত্র জুভেন্টাসের প্রাক্তন সভাপতি গিয়ামপিরে বোনাপার্তি ছাড়া।

বোনাপার্তিই একমাত্র চিনেছিলেন সিলাচ্চির গোল করার নেশাকে। তাই অনেক কষ্টে সাড়ে তিন লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন মেসিনার কাছ থেকে। তাও মেসিনা ক্লাবের সভাপতি মাসিমিনো এত ভালবাসতেন সিলাচ্চিকে যে ছাড়বার আগে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন জুভেন্টাস পরবর্তীকালে অন্য কোনো দলে সিলাচ্চিকে ছেড়ে দেবে না। দেয়ওনি জুভেন্টাস। সিলাচ্চিও চান না কয়েকশ কোটি টাকার বিনিময়ে জুভেন্টাস ছেড়ে রিয়েল মাদ্রিদে যেতে। বরং তাঁর ইচ্ছে খেলা ছেড়ে দেবার পর নিজের শহর পালেরমোতে ফিরে যাবেন। সেখানে স্ত্রী ও দুই পুত্র জেসিকা-মাত্তিয়াকে নিয়ে থাকবেন।

এই পালেরমোতেই মাত্র তের বছর বয়সে সিলাচ্চির ফুটবল জীবনের শুরু। সেই ছোট্ট ক্লাবের থেকে তখন পেতেন মাসে পঁচিশটি করে পাউন্ড। তারপরে সতের বছর বয়সে ছ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে চলে যান মেসিনা ক্লাবে। মাসিক বেতন হয় একশ পঁচিশ পাউন্ড। আর এখন সিলাচ্চি মানেই অর্থের সমুদ্র। তবুও স্বভাবে শান্ত মানুষটি বিশ্বাস করেন ভাগ্যে আর পরিশ্রমে। অর্থের চেয়েও তাঁর কাছে অনেক বড় সম্মান, আর তার জন্যই লক্ষ্য বিশ্বকাপে নিজের নামটা লিখে রাখার।

জুভেন্টাসের হয়ে সিলাচ্চির সাফল্য শুরু হয়েছিল আমেরিকায় একটি খেলা থেকে। দেখা যাক এবারের বিশ্বকাপে আমেরিকায় সিলাচ্চি সেরকম কোনো ভেল্কি দেখান কিনা।

পড়ার সঙ্গে খেলা

ডেভিড সেশুন হাই স্কুল

শ্রীমতী সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

তালদির পরের স্টেশনের নাম ক্যানিং। এর অদূরেই বয়ে গিয়েছে বিশাল মাতলা নদী, সুন্দরবন যাওয়ার প্রবেশপথ। ১৮৬৩ সালে লর্ড ক্যানিং এই অঞ্চলে আসেন। তাঁর উদ্যোগে এখানে একটি বন্দর স্থাপিত হয়। এখন সেটি লঞ্চঘাটা নামে পরিচিত। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ ডেভিড সেশুন হাই স্কুল।

প্রায় ৬১ বছর আগে প্রয়াত লক্ষ্মীনারায়ণ সিং ও কতিপয় বিদ্যানুরাগী মানুষের উদ্যোগে ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং-এ একটি স্কুল স্থাপিত হয়। বোম্বাইনিবাসী পার্শী জমিদার ও ব্যবসায়ী ডেভিড সেশুন তখন পোর্ট ক্যানিং এন্ড ল্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট কোম্পানির মালিক হয়ে এখানে এসেছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাসিক একশ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দেন। বলা বাহুল্য তাঁর নামেই স্কুলের নামকরণ হয়। এটি সুন্দরবন অঞ্চলের সব থেকে পুরনো স্কুল। এখানে যারা পড়তে আসে তাদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর পরিবারের সন্তান। বিগত কয়েক বছর ধরে বেশকিছু আন্তর্জাতিক মানের সাঁতারু উপহার দেবার সুবাদে স্কুলটিকে ১৯৮৮ সালে স্পোর্টস স্কুল হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্কুলে প্রবেশ করার মুখেই পড়ে ৩৩১/২ মিটার দৈর্ঘ্যের সুইমিং পুল। প্রতিদিন বিকেলবেলায় প্রায় ১৫০ জন ছেলেমেয়ে পুলে সাঁতারের অনুশীলন করে। মেয়েদের সংখ্যা অবশ্য কম। সুনীল ঘোষ মহাশয় সাই-এর কোচ হিসাবে নিযুক্ত আছেন। প্রাক্তন ছাত্র সোনাচাঁদ নন্দী স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এছাড়া গেমস্ টিচার গুপ্তধন চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল অনুশীলনে সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

চৌধুরী মহাশয় এই প্রতিবেদককে অনেকক্ষণ সময় দিলেন। ওনার কাছ থেকেই যাবতীয় তথ্য জানা গেল।—স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। মহানন্দ নন্দী এশিয়াডে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। রুনু দাস একবার ভারতীয় ওয়াটার-পোলো দলের সহ-অধিনায়ক হয়েছিল। রীণা চক্রবর্তী একবছর ভারতীয় ওয়াটার-পোলো দলের সদস্যা ছিল। প্রতিবছর চার থেকে ছ'জন সাঁতারে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। গতবছর গোপাল নন্দী জাতীয় পর্যায়ে দুটো সোনা ও একটি রুপো পেয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

সাঁতার ছাড়া অন্যান্য খেলা যেমন ফুটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস এসবেরও অনুশীলন করানো হয়। তবে মাঠের অবস্থা খুব খারাপ বলেই মনে হলো। তবু তার মধ্যে ছেলেরা গতবছর অ্যাথলেটিকস-এ জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়ে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। উন্নয়নের প্রশ্ন আসতেই স্কুলের কর্মী দেবাশিস চক্রবর্তী জানালেন যে সেন্ট-জেভিয়ার্স কলেজের এলামনি এসোসিয়েশন ও মাতলা ২ নং পঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তায় সুইমিংপুলের দুদিকের ডাইভিং বোর্ড নির্মাণের কাজ চলছে।

খেলাধূলার সঙ্গে সমানতালে চলে পড়াশোনা। সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার খুব ভাল। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগ ও স্টার পায়। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র নির্মল শিকদার বর্তমানে মান্তি হাউসে ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল হিসাবে কর্মরত আছেন। আর একজন কৃতী ছাত্র নীহারেন্দু শিকদার বিদেশে এডুকেশান অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

পরিশেষে বলি স্কুলের অধিকাংশ সাঁতারুই আসে দিনমজুর পরিবার থেকে। সাই ১৫ জনের টিফিন ও কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছে। বাকী সম্ভাবনাপূর্ণ সাঁতারু ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের দিকে যদি কোনোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আমরা বহুসংখ্যক কৃতি নাগরিক পেতে পারি—যা আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে।

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

(হায়ার সেকেন্ডারী • জয়েন্ট এন্ট্রান্স • সর্বভারতীয় বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(প্রশ্নোত্তরে)

সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে সরাসরি লিখুন

নিউ বেংগল প্রেস প্রাঃ লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

ভুজঙ্গাসন

চিন-সাপোর্ট ভুজঙ্গডন

নূতন বছর পড়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমার পুরাতন পাঠকরা বেশ কিছু ব্যায়াম শিখে নিয়েছে। নিয়মিত অভ্যাস করে অনেকের শরীর স্বাস্থ্য যে ভাল হয়েছে তা তোমাদের চিঠি-চাপাটি দেখে বুঝতে পারি। আমি হলফ করে বলতে পারি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যায়াম, যোগব্যায়াম বা খেলাধূলা করলে শরীর-স্বাস্থ্য-মন ভাল হবেই হবে। নিয়মিত ব্যায়ামে মনের চঞ্চলতা দূর হবে। ফলস্বরূপ একাগ্রতা বাড়বেই বাড়বে। একাগ্রতা বাড়াবার জন্য তাই সকলকেই বলি নিয়মিত ব্যায়াম কর।

আগে তোমাদের আমি বেশ কয়েকরকমের ভুজঙ্গাসন শিখিয়েছি। কি? মনে আছে তো। আমার নূতন পাঠকদের একটুখানি আবার বলে দিই আর পুরাতনদের জন্য রইল চিন্-সাপোর্ট ভুজঙ্গডন বা থুতনিতে চাপ দিয়ে ভুজঙ্গডন।

প্রথমে ভুজঙ্গাসন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। পা দুটি জোড়া অবস্থায় থাকবে। দুহাতের তালু বুকের দুপাশে এমনভাবে মাটিতে পেতে রাখ যাতে আঙুল কাঁধের সমান্তরাল থাকে এবং কনুইদ্বয় গায়ের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার কোমর থেকে জোর দিয়ে মাথা, বুক ও তলপেট মাটি থেকে তোল। প্রথম প্রথম হাতের জোরেই তোল। পরে দেখবে কোমরের জোরেই তুলতে পারছ। হাত অল্প ভাঁজ অবস্থায় থাকবে। যদি এভাবে করতে না পার তখন হাত সম্পূর্ণ সোজা করে দিও।

এ তো গেল ভুজঙ্গাসন। এখন শেখাই চিন্-সাপোর্ট ভুজঙ্গডন। উপুড় হয়ে ঐ ভুজঙ্গাসনের মতোই শুয়ে পড়। দুহাতের আঙুল পরস্পরের ভিতর গলিয়ে দিয়ে তালুর উপর-পিঠ থুতনির তলায় রাখ যেভাবে ছবিতে মেয়েটি রেখেছে। এখন শ্বাস নিতে নিতে কোমরের জোরে মাথা বুক পাঁজর যতটা পার সামনের ছেলেটির মতন তোল। এই অবস্থানে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ১৫-২০ সেকেন্ড থাকতে চেষ্টা কর। তারপর উপুড় হয়ে বিশ্রাম নাও ১৫-২০ সেকেন্ড। একমাত্রায় হলো। দু-তিন মাত্রায় অভ্যাস কর। এটি শিরদাঁড়া ও কোমরের ভাল ব্যায়াম। অনুশীলনে কোমর ও শিরদাঁড়ার বিভিন্ন বাতজনিত ব্যথা দূর হয়।

চিন-সাপোর্ট ভুজঙ্গডন

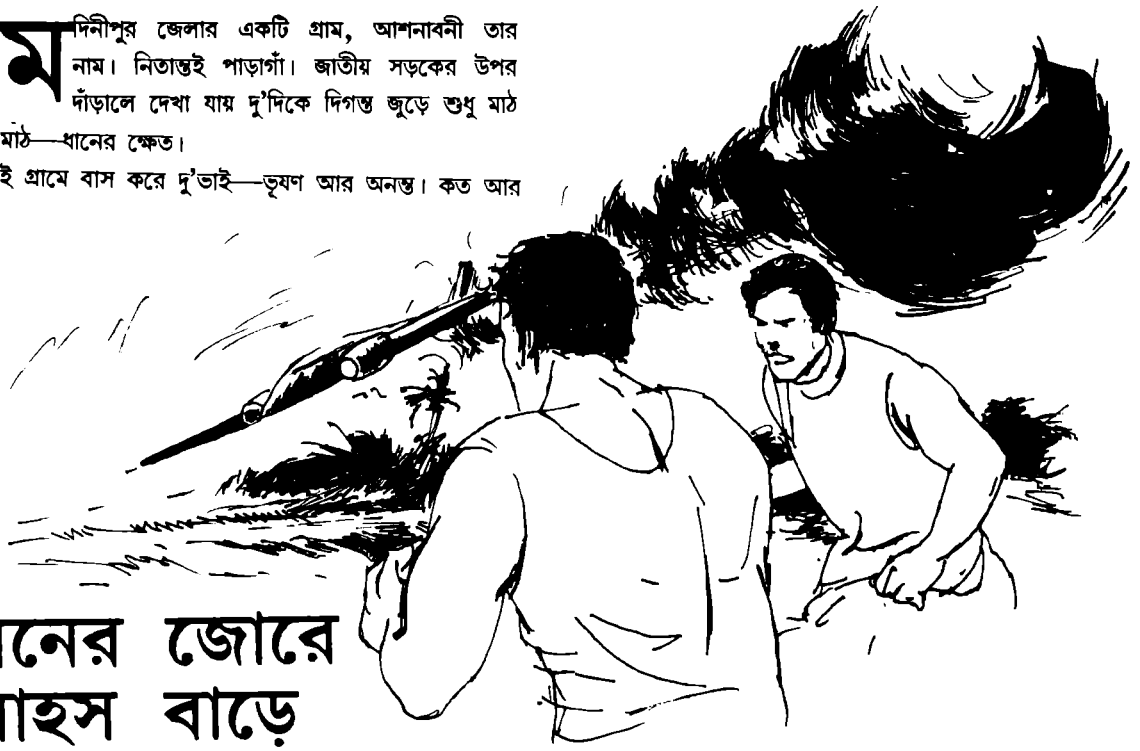

মনের জোরে সাহস বাড়ে

জীবনময় গুহ

মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম, আশনাবনী তার নাম। নিতান্তই পাড়াগাঁ। জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়ালে দেখা যায় দু'দিকে দিগন্ত জুড়ে শুধু মাঠ আর মাঠ—ধানের ক্ষেত।

এই গ্রামে বাস করে দু'ভাই—ভূষণ আর অনন্ত। কত আর বয়স হবে? সতেরো কি আঠারো। মা-বাবা নেই। বড়ই গরীব। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু শিখতে পারেনি। অপরের জমিতে জনমজুর খাটে। তাও আবার সারা বছর কাজ জোটে না। ধান বোনা আর ধান কাটার সময়েই যা কিছু কাজ পায়। বাকি সময়টা খেলাধূলা করেই কাটিয়ে দেয়।

গরীব হলে কি হবে শরীর স্বাস্থ্য ওদের বেশ ভালই। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। যেমন গায়ের জোর, তেমনি মনের জোর। সংসারে দু'টি মাত্র প্রাণী, দু'ভাই। বেশি লোভও নেই, চাহিদাও নেই।

তখন বর্ষাকাল। ধান বোনার মরসুম। দু'ভাই কাজ করে ধানের ক্ষেতে। জল কাদায় দাঁড়িয়ে ধানের চারা বোনে মনের আনন্দে, আর গান করে গলা ছেড়ে—ধান বোনার গান। আর তাতেই ভুলে থাকে হাড়ভাঙা খাটুনির পরিশ্রম।

সেদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। হয়তো বৃষ্টি হবে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। হঠাৎ কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়লো কড়কড় শব্দে। কাজ করতে করতে চমকে উঠলো ভূষণ আর অনন্ত। উপর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই ওরা অবাক হয়ে দেখল বিমানবাহিনীর একটা ছোট বিমান টলতে টলতে নেমে আসছে নিচের দিকে। লেজের দিকটায় ধরে গেছে আগুন। বিমানটি পাক খেতে খেতে একসময় মুখ থুবড়ে পড়ল ধানক্ষেতে—জল কাদার মধ্যে। মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন।

চোখের সামনে ভেঙে পড়া বিমানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে হকচকিয়ে গেল দু'ভাই। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ তাদের মনে হলো, কিছু একটা করা দরকার। ছোট ভাই অনন্ত বলল, 'দাদা বিমানের মধ্যে লোকজন থাকতে পারে।'

ভূষণ বলল, 'অন্য লোকজন না থাকলেও পাইলট একজন নিশ্চয়ই আছে।'

'চল দাদা, দেখি বাঁচাতে পারি কি না।'

'তাই চল।'

মনের জোরে সাহসে ভর করে দু'ভাই ছুটে গেল জ্বলন্ত বিমানের কাছে। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে গেল আগুনের হলকার মধ্যে।

বিমানের সামনের দিকটা দুমড়ে গেলেও, ধানক্ষেতের জল-কাদায় আগুনের তেজ কমে এসেছে। যদিও উঁচু হয়ে থাকা পিছন দিকটা তখনও জ্বলছে দাউ দাউ করে।

দোমড়ানো ককপিটের কাছে যেতেই একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ শুনতে পেল ওরা। বুঝল, তখনও বেঁচে আছে পাইলট। দুজনে ভিতরে ঢুকে অতি কষ্টে আহত পাইলটের অচেতন দেহটা টেনে বের করে নিয়ে এলো বিমানের বাইরে। ইতিমধ্যে দু'ভাইয়ের

পাইলটের দেহটা কাঁধে তুলে....

দেহের নানা অংশ গেছে পুড়ে বা কেটে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, অর্ধমৃত পাইলটের দেহটা কাঁধে তুলে ওরা ছুটলো ক্ষেতের আল ধরে জাতীয় সড়কের দিকে।

ততক্ষণে নামল বৃষ্টি। বেশ জোর বৃষ্টি।

জাতীয় সড়কের উপর উঠে দু'ভাই টের পেল ওরাও আহত হয়েছে ভীষণভাবে। পা আর চলতে চায় না। দেহে যেন আর শক্তি নেই। পাইলটকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে দুজনেই অবসন্ন দেহে ভেঙে পড়লো ক্লান্তিতে, হারিয়ে ফেলে জ্ঞান।

একটু পরেই একটা বাস এলো সেই পথে। পথের উপরে তিনটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। বাস থামিয়ে নিচে নেমে দেখে তিনটি দেহই অগ্নিদগ্ধ ও রক্তাক্ত। একজনের দেহে ছিন্নভিন্ন সামরিক পোশাক। অদূরে ধানক্ষেতে ভেঙে পড়া বিমানটি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুচ্ছে দেখে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। লোক তিনটির বুকে কান রেখে সে বুঝতে পারে, অচেতন হলেও তাদের প্রাণ আছে।

ইতিমধ্যে গ্রামের কিছু লোকজন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। সকলে মিলে আহত তিনজনকে তুলে দেয় বাসে। বাস ছুটল শহরের হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতাল থেকে খবর গেল থানায়, থানা থেকে জেলা সদরে। সেখান থেকে কলকাতা এবং সবশেষে রাজধানী দিল্লিতে।

সামরিক বিভাগ থেকে এম্বুলেন্স নিয়ে ছুটে এলেন একদল অফিসার। প্রাথমিক চিকিৎসার পর, গুরুতর ভাবে আহত পাইলটকে তাঁরা নিয়ে যান সামরিক হাসপাতালে। আর দু'ভাইয়ের চিকিৎসা চলতে থাকে সিভিল হাসপাতালে।

প্রায় এক মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে ভূষণ আর অনন্ত। গ্রামবাসীরা দেখতে আসে দু'ভাইকে। জানায় বাহবা, করে প্রশংসা। তাতেই ওরা খুশি।

কিছুদিন পর আবার মাঠের কাজে নামে দু'ভাই। দিন যায়, মাস যায়। কাজের মাঝে একদিন ভুলেও যায় সেদিনের সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কথা, মারাত্মকভাবে আহত হবার কথা।

আরও কিছুদিন পর, হঠাৎ একদিন থানার বড়বাবু জিপ নিয়ে হাজির হলেন সেই গ্রামে। ডেকে পাঠালেন ভূষণ আর অনন্তকে। দু'ভাই তো ভয়ে কাঠ। বড়বাবু তাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'ভয় নেই। তোমাদের জন্য সুখবর আছে। এই দেখ চিঠি। তোমাদের নামে ভারত সরকারের চিঠি।'

বড়বাবুই পড়ে শোনালেন চিঠি—

'প্রিয় ভূষণ ও অনন্ত,

তোমরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে যেভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অগ্নিদগ্ধ বিমান থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একজন পাইলট অফিসারের জীবন রক্ষা করেছ, তাতে দেশবাসী এবং ভারত সরকার তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের অসাধারণ সাহস আর বীরত্বের জন্য ভারত সরকার তোমাদের দুজনকে 'শৌর্য চক্র' পদক দিয়ে পুরস্কৃত করতে চান। আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব অনুষ্ঠানে তোমাদের হাতে 'শৌর্য চক্র' পদক তুলে দেবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। ঐ দিন দিল্লীতে এসে পুরস্কার গ্রহণের জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।'

গ্রামের বাইরে যারা পা বাড়ায়নি কোনোদিন, আজ সেই অজানা অচেনা দুই গ্রাম্য কিশোর ডাক পেয়েছে দিল্লীতে ভারত সরকারের কাছ থেকে। একথা ভাবতেই গর্বে, আনন্দে, দু'ভাইয়ের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল আনন্দের অশ্রু।

খবরের কাগজে ছবি দিয়ে ছাপা হলো দু'ভাইয়ের সাহসিকতার কাহিনী, সম্মান ও পুরস্কার ঘোষণার কাহিনী। গ্রামবাসীরা আনন্দে অধীর, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, গ্রাম রক্ষীবাহিনী থেকে শুরু করে বহু প্রতিষ্ঠান অভিনন্দন জানায় দু'ভাইকে।

দিল্লী থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসার পর গ্রামবাসীরা দু'ভাইকে জানায় বীরের সম্মান। তারা আশনাবনী গ্রামের গৌরব, গ্রামবাসীদের গর্ব।

আজ ভূষণ আর অনন্ত শুধু আশনাবনীর নয়, সমগ্র দেশের গৌরব, সকল দেশবাসীর গর্ব।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

ছবি: ধ্রুব রায়

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। তারাদের রং আলাদা আলাদা হয় কেন?

২। পৃথিবীর সবথেকে গভীর খনি কোথায় আছে?

৩। সবচেয়ে বেশি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কোন দেশে?

৪। যে সাবমেরিনটি সর্বপ্রথম বরফের তলা দিয়ে উত্তর মেরু অতিক্রম করে তার নাম কি?

৫। ১৮৯৫ সালে কিং ক্যাম্প জিলেট একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেন। সেটি কি?

৬। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও আবিষ্কারক ছিলেন?

৭। কোন হরিণকে গৃহপালিত করা হয়েছে?

৮। কোন ধরনের সাপ উড়তে পারে?

৯। বাচ্চা দেবার জন্য বাসা তৈরি করে কোন মাছে?

উত্তর ঃ

১। পৃষ্ঠদেশের উত্তাপের উপর নির্ভর করে তারাদের বিভিন্ন রং হয়। যেমন সবচেয়ে ঠাণ্ডা তারা যাদের উত্তাপ প্রায় ৩,০০০° সেন্টিগ্রেড (৬,০৩০° ফাঃ) তাদের রং লাল। যাদের উত্তাপ সবথেকে বেশি, ১০,০০০° সেন্টিগ্রেড (২০,০০০° ফাঃ) বা তার ওপরে তাদের রং নীল। আর সূর্য যার বহির্ভাগের উত্তাপ ৫,৫০০° সেন্টিগ্রেড (১১,০৩০° ফাঃ) তাকে দেখায় সাদাটে হলুদ।

২। দক্ষিণ আফ্রিকার কারলিটনভিল-এ। এই সোনার খনিটির গভীরতম অংশ মাটির উপর থেকে ৩.৭৭৭ কিলোমিটার নিচে।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ১,৭০০-র চেয়েও বেশি।

৪। ইউ এস এস নউটিলাস।

৫। সেফটি রেজার।

৬। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র গঠনে যে চারটি প্রধান সনদের দরকার হয় তার সবকটিতেই সই করেন। যেমন ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে; ১৭৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে; ১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে এবং ১৭৮৩ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম সমাপ্ত করে যে 'ট্রিটি অফ প্যারিস' তাতে। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে পড়ে লাইটনিং কন্ডাক্টর আর বাইফোকাল লেন্স।

৭। রেনডীয়ার বা বলগা হরিণকে। উত্তরমেরু বৃত্তের ল্যাপল্যান্ডের অধিবাসীরা এদের পোষ মানিয়ে যাবতীয় কাজ করিয়ে নেয় যা অন্য দেশে গবাদি পশুরা করে থাকে। রেনডীয়ার তাদের দুধ, চীজ ও মাংসের যোগানও দেয়। মৃত রেনডীয়ারের চামড়া থেকে তৈরি হয় পোশাক, হাড় থেকে ছুঁচ আর পেশীতন্তু থেকে সুতো।

৮। পাখির মতো ডানা ঝাপটে উড়তে না পারলেও ইন্দো-ম্যালোশিয়ার 'গোল্ডেন ট্রি স্নেক' নামে এক জাতের সাপ হাওয়ায় শরীর ভাসাতে পারে। গাছের মাথা থেকে শরীর ভাসিয়ে বা গ্লাইড করে নিচের শাখায় নেমে আসে। এই সময় তারা যতটা সম্ভব শরীরকে চ্যাটালো করে রাখে। ফলে খুব ধীরে ধীরে তারা নেমে আসতে পারে।

৯। স্টিকলব্যাক নামের এক ধরনের মাছ বাচ্চা দেবার সময় ছোট নালাকৃতি বাসা বানায়। বালি আর কাদা মিউকাস দিয়ে জুড়ে তারা এটি তৈরি করে।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

কোহিনূর

হিরণ্ময় রায়

পনেরোশ ছাব্বিশ খ্রীস্টাব্দের একুশে এপ্রিল। শুক্রবার। স্থান—দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পাণিপথের বিশাল প্রান্তর। সেদিনও সকালে অন্যান্য দিনের মতোই সূর্য উঠলো পূর্বাকাশ লাল করে। ধীরে ধীরে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠলো চারপাশ। অন্ধকার লজ্জা পেয়ে আবার রাত আসার অপেক্ষায় কোনো নিরালা কোণে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু পাণিপথের মাঠে কয়েকদিন ধরে যে থমথমে আবহাওয়া বিরাজ করছে তা আর কাটলো না। কাটা তো দূরের কথা, বরং অন্য দিনের তুলনায় আরো ভারি হয়ে উঠলো। ঝড় ওঠার আগের মুহূর্তে চারপাশের পরিবেশ যেমন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ঠিক তেমনি।

দিল্লী-আগ্রা দখল করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে চাইছেন মোগলবীর বাবর। প্রতিদ্বন্দ্বী দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী। তাঁদের মধ্যে এই পাণিপথের মাঠেই কয়েক দিন ধরে চলছে ছোট-খাটো সংঘর্ষ। কিন্তু উভয় পক্ষই চূড়ান্ত ফয়সলার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং ঝড় উঠলো অচিরেই। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত ভারতীয় সুলতানী বাহিনী এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দিলো। সুলতান ইব্রাহিম লোদী স্বয়ং নেতৃত্ব দিলেন তাঁর বাহিনীকে। তবু এই যুদ্ধের ফলাফল গেল মোগল বাহিনীর অনুকূলে। কারণ, সুলতানী বাহিনীর তুলনায় মোগল বাহিনী সংখ্যার হিসাবে ছোট হলেও তাদের কাছে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, অর্থাৎ কামান ও বন্দুক, যা সুলতানী বাহিনীর ছিল না। এই কামান-বন্দুকের জোরেই বাবর জয়লাভ করলেন। তখনও দুপুর গড়ায়নি। সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধের তথা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সুলতান ইব্রাহিম লোদী রণক্ষেত্রে লাভ করলেন বীরশয্যা।

দুঃসংবাদ নাকি ছোটে বড়ো দ্রুত। তাই যুদ্ধে সুলতানী বাহিনীর পরাজয়, আর রণক্ষেত্রে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বীরগতি লাভের কথা যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। দিল্লী আর আগ্রা শহরেও এসে পৌঁছে গেল সে সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে মানুষজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল কানাকানি আর ফিসফাস, এর সঙ্গে ওর আর ওর সঙ্গে তার গোপন শলা-পরামর্শ। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষজন শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাতে শুরু করল। দুটি শহরেরই অলিতে-গলিতে, কোণে-কোণে আর মানুষজনের মনে পাণিপথ-বিজয়ী মোগল বাহিনীর নামে নেমে এলো আতঙ্কের ছায়া।

এই আতঙ্ক আগ্রা শহরের সুলতানী প্রাসাদকেও গ্রাস করল। ভয়ে হতাশায় ভেঙে পড়লেন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরিবার-পরিজনেরা। স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তো গেছেই, এবার বোধহয় মান-প্রাণও যাবে। পঙ্গপালের মতো এক্ষুণি ছুটে আসবে মোগল বাহিনী, দখল করবে রাজপ্রাসাদ, আর তারপরই শুরু হবে লুঠতরাজ, হত্যা। মান-প্রাণ বাঁচাতে গেলে এক্ষুণি তাই এই প্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আবারও ভাবলেন তাঁরা—এতদিনের পরিচিত এই প্রাসাদ, এই জাঁক-জমক, এই ঐশ্বর্য এসব কি এক কথায় ত্যাগ করে যাওয়া যায়! তাছাড়া এসব ত্যাগ করে তাঁরা যাবেনই বা কোথায়? যাবার জায়গাও যে তাঁদের কোথাও নেই!

তা সত্যিই। প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যাবার জায়গা মৃত সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরিবার-পরিজনদের নেই। সুতরাং শোক, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে এই প্রাসাদেই তাঁদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে মোগল বাহিনী না আসা পর্যন্ত। তারপর, জীবন অথবা মৃত্যু—যা আছে কপালে তাই মেনে নিতে হবে। এছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু উপায় যাঁদের আছে, তাঁরা কেন এমন বিপদ মাথায় করে এখনোও এই প্রাসাদে পড়ে থাকবেন?....গোয়ালিয়রের রাজমহিষী সুদক্ষিণা ও তাঁর জনকয়েক পরিজন একপ্রকার বাধ্য হয়েই আগ্রায় লোদী প্রাসাদে ইব্রাহিম লোদীর পরিবার-পরিজনদের

সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ তাঁদের সেখানে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। পাণিপথের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সুলতান ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদ থেকে বলপূর্বক তাঁদের আগ্রায় নিজের প্রাসাদে নিয়ে এসেছিলেন। শর্ত ছিল গোয়ালিয়র অধিপতি বিক্রমজিৎ যদি পাণিপথের যুদ্ধে তাঁর পক্ষে যোগ দেন তাহলে যুদ্ধ মিটে যাবার পর তিনি তাঁদের ছেড়ে দেবেন। অন্যথায় তাঁরা কোনোদিনই ছাড়া পাবেন না।...গোয়ালিয়র অধিপতি বিক্রমজিৎ তাই বাধ্য হয়েই পাণিপথের যুদ্ধে সুলতানের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

রানী সুদক্ষিণা যখন এই খবর শুনলেন তখন ভাবলেন, কেন আমি এই ভয়ংকর বিপদ মাথায় করে এখনও এই প্রাসাদে পড়ে থাকবো? আমি এক্ষুণি আমার লোকজনদের নিয়ে এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবো। যদি আটকায় তো জোর করে যাবো। আমার ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তবে আর এই সুলতান পরিবারকে আমার কিসের ভয়?

চোখের জলকে দৃঢ় শাসনে বেঁধে রানী সুদক্ষিণা দৃপ্তভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালেন ইব্রাহিম লোদীর জননী বুয়া বেগমের সামনে। বললেন, 'শুনলাম, মোগল বাহিনী আসছে প্রাসাদ দখল করতে। এই অবস্থায় আর একটা মুহূর্তও আমরা এখানে থাকবো না। আমরা আজই এখান থেকে চলে যাবো।'

সুদক্ষিণার মুখের দিকে চেয়ে ম্লান কণ্ঠে বুয়া বেগম বললেন, 'সত্যি-ই চলে যাবে?'

সে কথার জবাবে তেমনিই দৃঢ় স্বরে সুদক্ষিণা বললেন, 'হ্যাঁ, যাবো। আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই-ই তো হয়েছে। আপনাদের কথামতোই রাজা বিক্রমজিৎ পাণিপথের যুদ্ধে আপনাদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধে তিনি আপনাদের জন্য প্রাণও দিয়েছেন। এবার আপনাদেরই দেওয়া শর্ত অনুসারে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে দিন।'

বুয়া বেগম বললেন, 'এখন আর কে কাকে আটকে রাখবে মা? আমরা নিজেরাই কোথায় যাবো, কী করবো, তারই ঠিক নেই, এর ওপর আবার তোমাদের ভাবনা কখন ভাববো মা?... না না, শেষে আমাদের জন্য তোমরাও বিপদে পড়বে। তার চেয়ে তোমরা এক্ষুণি চলে যাও, যেমন করে পারো তোমরা বাঁচো। আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

রানী সুদক্ষিণা আর দেরি করলেন না, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আগ্রা ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্য তাঁর গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদ।

কিন্তু যাবো বললেই তো আর যাওয়া যায় না। একটা বাধা সরতে না সরতেই উপস্থিত হয় আর একটা বাধা। ইব্রাহিম-জননী বুয়া বেগমের অনুমতি লাভের পর রানী সুদক্ষিণা যখন তাঁর লোকজনদের নিয়ে সুলতানী প্রাসাদ ত্যাগ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখনই খবর এল বাবরের পুত্র হুমায়ুন আগ্রা-প্রাসাদ অবরোধ করেছে। বাবর পাণিপথ থেকে আগ্রায় না আসা পর্যন্ত এই ভাবেই প্রাসাদ অবরোধ চলবে। তারপর তিনি আগ্রায় এসে পৌঁছালে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রাসাদ ও কোষাগার দখল করা হবে।

এ কথা শুনে রানী সুদক্ষিণা একটু থমকে গেলেন। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়লেন না। মনে মনে স্থির করলেন যাই-ই হোক, তাঁর লোকজনদের নিয়ে এ অভিশপ্ত প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবেনই তিনি। আর যাবেন মোগলরা প্রাসাদ দখল করে লুটপাট শুরু করার আগেই।

দৃঢ়সংকল্প সুদক্ষিণা দূত পাঠালেন হুমায়ুনের কাছে। নিজের পরিচয় জানিয়ে অনুমতি চাইলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার।

রানী সুদক্ষিণার আর্জি শুনে হুমায়ুন একটু অবাক হলেন। হিন্দুরানী কেন সুলতানের প্রাসাদে! একটু কৌতূহলও হলো তাঁর। যাই হোক তিনি রানী সুদক্ষিণাকে সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলেন।

রানী সুদক্ষিণা সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় তিনি সঙ্গে নিলেন ছোট্ট একটি পেটিকা—যার মধ্যে ছিল তাঁর নিজস্ব কিছু মূল্যবান রত্ন। উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এগুলোকেও কাজে লাগাবেন।

হুমায়ুন রানীকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমি জানতে পারি কি কোন প্রয়োজনে প্রাসাদ ছেড়ে

আপনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন?'

রানী সুদক্ষিণা কাতরকণ্ঠে বললেন, 'একটি সামান্য অনুরোধ নিয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি মহানুভব মোগলবীর। আপনি শুনেছেন, আমি গোয়ালিয়রের রাজমহিষী। কিন্তু হিন্দু হয়েও কেন সুলতানের প্রাসাদে থাকতে হয়েছে সে ইতিহাস জানেন কি? এই কুচক্রী সুলতান কয়েকজন পরিজন সমেত আমাকে জোর করে ধরে আনেন এখানে। আমার স্বামীকে বলেন তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করলে তবেই আমি মুক্তি পাব। অনন্যোপায় গোয়ালিয়র-রাজ বাধ্য হয়ে তাঁর শর্তে রাজী হন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি সে শর্ত পূরণ করেন। আজ আমি নিঃস্ব। এ প্রাসাদ আমার ঘর নয়, সুলতানের পরিবারের কেউও আমার আপন নয়। আমি গোয়ালিয়রে স্বামীর রাজ্যে ফিরে যেতে চাই।'

আবেদন যতই কাতরতাপূর্ণ আর যথার্থ হোক, বাবরপুত্র হুমায়ুন তাতে বিচলিত হবার মতো মানুষই নন। বিচলিত তিনি হলেনও না। ঠাট্টার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এত লোক থাকতে রানীজী যে আমাকেই মুক্তিদাতা ঠাওরেছেন এ আমার অসীম সৌভাগ্য। মুক্তি আমি ইচ্ছা করলে এক্ষুণি দিতে পারি, কারণ, এখানে উপস্থিত মোগল বাহিনীর বর্তমান সর্বেসর্বা আমিই। তবে মুক্তি দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার।'

রানী সুদক্ষিণা মনে মনে হাসলেন সে-কথা শুনে। এত সহজে যে মুক্তি পাবেন না তা তিনি জানতেন। তাই তো সঙ্গে এনেছেন তাঁর রত্নপেটিকা। এরপর তিনি সেই পেটিকা খুলে তার ভিতরের রত্নগুলি হুমায়ুনকে দেখিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, মুক্তি দেওয়াটা একটু সহজ করা যায় না? নইলে লুটপাটের সময় আমার এই দামী দামী রত্নগুলো যে কার হাতে পড়বে কে জানে?' পেটিকাস্থিত রত্নগুলির মধ্যে থেকে বহু মূল্যবান একটি হীরকখণ্ড বেছে তুলে নিয়ে সুদক্ষিণা আপন মনেই যেন বলতে লাগলেন, 'আমার এত দামের এই হীরে কার হাতে পড়বে! এটাকে নিয়েই তো আমার বেশি চিন্তা। আহা! এত দামী, এত সুন্দর হীরে!' বিমর্ষমুখে তিনি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হীরকখণ্ডটি দেখতে লাগলেন, এমনভাবে দেখতে লাগলেন যাতে হুমায়ুনের দৃষ্টি সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

রানী সুদক্ষিণা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিরকখণ্ডটি দেখছেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর কানে গেল হুমায়ুনের প্রশ্ন, 'এই মূল্যবান রত্নটি—মানে হীরকখণ্ডটি কি সত্যিই আপনার?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় তুলে মদু হেসে রানী সুদক্ষিণা তাকালেন হুমায়ুনের দিকে। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। হুমায়ুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে হীরকখণ্ডটির প্রতি।

রানী সুদক্ষিণা আবারও হাসলেন। তাঁর মিষ্টি হাসির ঝঙ্কারে চমকে মুখ তুলে তাকালেন হুমায়ুন। লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন কিছু মনে করবেন না। হীরকখণ্ডটি দেখে আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম।'

রানী সুদক্ষিণা তেমনি হাসিমুখেই বললেন, 'এমন মূল্যবান একটি হীরকখণ্ড দেখে ওরকম হতেই পারে। আসলে কী জানেন—এটি (হীরকখণ্ডটি হুমায়ুনের চোখের সামনে তুলে ধরে) হলো পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান হীরকখণ্ড। এর ওপর অনেকেরই লোভ। এর মূল্য সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আড়াই দিনের খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের সমান। আর এর নাম কোহিনূর অর্থাৎ জ্যোতির সমুদ্র। এই দেখুন', বলে হীরকখণ্ডটি তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে হুমায়ুনকে দেখালেন। হীরকের প্রখর ঔজ্জ্বল্যে হুমায়ুনের দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উল্লসিত হয়ে তিনি বললেন, 'আরে, এ যে সত্যিই কোহিনূর! জ্যোতির সমুদ্র!'

রানী সুদক্ষিণা বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্যিই জ্যোতির সমুদ্র। এটি কি আপনি পেতে চান?'

হুমায়ুন বললেন, 'এত দামী একটি হীরে চাইলেই কি আপনি অমনি অমনি দিয়ে দেবেন আমাকে? আমি অবশ্য ইচ্ছা করলে ওটা এক্ষুণি আপনার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু গায়ের জোর ফলাবার, লুটপাট করবার হুকুম তো আমরা এখনো পাইনি রানীজী!'

রানী সুদক্ষিণা বললেন, 'না, না, একটা সামান্য হীরের জন্যে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আর লুটপাটও করতে হবে না। এটা আমি আপনাকে এমনিই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিন।' তিনি সত্যি সত্যিই সেই হীরকখণ্ডটি গুঁজে দিলেন হুমায়ুনের হাতে। এ একেবারে মেঘ না চাইতেই জল! দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান হীরকখণ্ড কোহিনূর এলো বাবরপুত্র হুমায়ুনের মুঠিতে। কী সৌভাগ্য!

রানী সুদক্ষিণার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হলো। বাবরপুত্র হুমায়ুন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলেন। উদার অমায়িক কণ্ঠে তিনি রানী সুদক্ষিণাকে বললেন, 'আপনাকে মুক্তি দেওয়ার কাজটা বুদ্ধির জোরে আপনি নিজেই সহজ করে দিলেন। কে জানে লুটপাটের সময় এমন দামী হীরেটা কোন বোকার হাতে পড়তো? সে হয়তো এর মূল্যই বুঝতো না। আমি অশেষ ভাগ্যবান যে এটা আমার হাতে পড়েছে। আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই রানীজী! আপনি মুক্ত। এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।'

রানী সুদক্ষিণা কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানালেন মহানুভব হুমায়ুনকে।

এর বহুক্ষণ পরে প্রথম পাণিপথ বিজয়ী বীর জহির-উদ-দিন মহম্মদ বাবর সসৈন্যে উল্কার বেগে এসে হাজির হলেন আগ্রায়। মিলিত হলেন পুত্র হুমায়ুনের সঙ্গে।

রানী সুদক্ষিণা ততক্ষণে তাঁর পরিজনদের নিয়ে ইব্রাহিম লোদির প্রাসাদ ত্যাগ করে আগ্রা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গোয়ালিয়রের পথ ধরেছেন। তাঁদের বংশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ 'কোহিনূর' তিনি তুলে দিয়ে এসেছেন হুমায়ুনের হাতে। আর তার বিনিময়ে পেয়েছেন মুক্তি। তাঁর কাছে এই মুক্তির মূল্য সহস্র কোহিনূরের মূল্যের থেকেও অনেক বেশি।

ছবি: প্রসাদ রায়

সত্যি !

কবরে ফেরা

হাইতি দ্বীপের অধিবাসীদের বিশ্বাস ভুডু পুরোহিতেরা মরা মানুষ বাঁচাতে পারে। তারা তখন পুরোহিতদের সব হুকুম তামিল করে। এই নতুন করে বেঁচে-ওঠা মানুষদের বলা হয় জুমবি। এদের নুন খাওয়ানো একদম বারণ। নুন খেলেই নাকি তারা বুঝতে পারে পুরোহিতরা তাদের চাকর করে রেখেছে। তখন তাদের সামলানো অসম্ভব ব্যাপার। উইলিয়াম বি সীব্রুকের লেখা 'দ্যা ম্যাজিক আইল্যান্ড' বইটিতে এইরকম একটা ঘটনার উল্লেখ আছে।

জোসেফ নামে এক ভুডু পুরোহিতের বেশ কয়েকটা জুমবি ছিল। সে তাদের দিয়ে আখ কাটাত। তাদের দেখাশোনা করত জোসেফের স্ত্রী। একদিন সে মস্ত একটা ভুল করে বসল। জুমবিদের খেতে দিল নোনতা বাদাম দেওয়া কিছু খাবার। নুন খাবার পরই জুমবিরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। তখন পুরোহিতের বাড়ি ছেড়ে তারা সবাই রওনা দিল তাদের গ্রামের দিকে। গ্রামে ঢুকতেই তাদের দেখে ভীষণ খুশি হয়ে উঠল আত্মীয়স্বজনরা। হৈ হৈ করে তারা এগিয়ে এল অভ্যর্থনা জানাতে। জুমবিরা কিন্তু কারুর কথায় কান না দিয়ে, কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো কবরখানায়। সেখানে পৌঁছে যে যার কবরে ঢুকবে বলে তারা শুধু হাত দিয়েই মাটি খুঁড়তে গেল। কিন্তু যেই না মাটিতে হাত দেওয়া অমনি তারা সবাই আবার শব হয়ে গেল।

জ্বলন্ত সৈকত

বালিতে কি আগুন লাগতে পারে? উত্তরে সবাই বলবে, না, এ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে কিটারি পয়েন্ট মেন-এর সমুদ্রতীরে বালুবেলায় সত্যি সত্যিই আগুন জ্বলে উঠেছিল ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যে সাতটা থেকে আটটার ভেতর ব্যাপারটা ঘটে। চলে ৪৫ মিনিট। খুব কাছেই ছিল পার্কফিল্ড হোটেল। সেখান থেকে সবাই দেখছিল শুধু বালি নয়, আগুন জ্বলছে জলের উপরেও। আগুনের শিখার উচ্চতা প্রায় এক ফুট। একশো গজ দূর থেকে আগুন জ্বলার চড়বড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে কটু সালফুরাস অ্যাসিডের গন্ধে সারা হোটেল ছেয়ে গেল। মালিক, স্টাফ ও অতিথিদের তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একজন অতি উৎসাহ আর কৌতূহলের বশে খানিকটা বালি হাতে নিতেই ছ্যাঁকা খেলেন। এতটাই গরম ছিল সেটা! এই গরম বালি কিছুটা জলের সঙ্গে মেশাতে দেখা গেল বালি থেকে গ্যাসের বুদবুদ বের হয়ে আসছে। এগুলোই জলের ওপর বাতাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠছে। পরে একজন বৈজ্ঞানিক সেখানকার বেলাভূমি পরীক্ষা করে বলেন, বালির তলায় আছে সামুদ্রিক আগাছার একটা স্তর। সেই আগাছাগুলোই গেঁজিয়ে উঠে ছোট ছোট পকেটে ফসফিন হাইড্রো-কার্বোন ও অন্যান্য গ্যাস সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সেদিন অমন আগুন জ্বলে উঠেছিল। খুবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। তাহলে তো যে কোনো সময় যে কোনো সমুদ্রতীরেই এমন কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। কোথায় কখন বালির তলায় আগাছার স্তর গেঁজিয়ে উঠছে কে জানে!

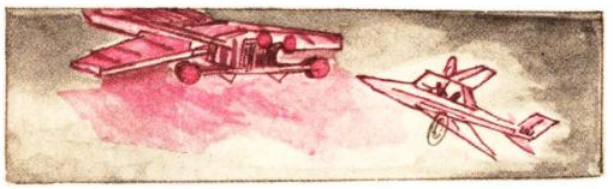

হারিয়ে গেল ফ্রেডারিক

১৯৭৮ সালের কোনো একদিন অস্ট্রেলিয়ার এক নবীন পাইলট ফ্রেডারিক ভ্যালেনটিক ভিক্টোরিয়ার মোরাবিন এয়ারপোর্ট থেকে তাঁর সেসনা ১৮২ প্লেনে চড়ে কিং আইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেন। আকাশে ওঠার ৫০ মিনিট বাদেই মেলবোর্নের এয়ারফ্লাইট কন্ট্রোলার স্টিভ রবিকে রেডিও মারফত জিজ্ঞেস করেন ওই এলাকায় চারটে উজ্জ্বল আলোওলা কোনো বড় আকাশযানের থাকার কথা আছে কিনা। স্টিভ তাঁকে জানান ওখানে ওই সময় কোনো প্লেন থাকার রিপোর্ট তিনি পাননি। ফ্রেডারিক সমানে স্টিভের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন ও যানটির গতিবিধির কথা তাঁকে জানাতে থাকেন। স্টিভের খবর অনুযায়ী ফ্রেডারিক তাঁকে বলেন যে যানটি যেন তাঁর সঙ্গে খেলায় মেতেছে। সেটা যে কি গতিতে উড়ছে তাও তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। একবার সেটা তাঁর পাশ দিয়ে উড়ে গেল। যানটি আকারে লম্বা। তাতে একটা সবুজ আলো আছে। যানটির গা থেকেও একটা ধাতব আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এর পরই ফ্রেডারিক খবর পাঠান আকাশযানটি তাঁর প্লেনের ওপর উড়ছে। ঠিক এই সময় সেসনার ইঞ্জিনে একটা আওয়াজ শুরু হওয়াতে ফ্রেডারিক বলেন তিনি কিং আইল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যানটিও তাঁর সঙ্গে চলেছে। তাঁর কথা শেষ হতেই শোনা যায় জোর একটা ধাতব শব্দ। ১৭ সেকেন্ড অনুরণিত হবার পর সেটা থেমে যায়। তারপরই সেসনার সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ফ্রেডারিক বা তাঁর প্লেনের দেখা কেউ আর কোনোদিন পায়নি। আকাশযানের রহস্য আর উদ্‌ঘাটন হলো না।

ছবি ঃ রাজা সরকার

কৌশলী দনুজমাধবদেব

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে রাজধানীতে এসে প্রবেশ করলো। তাকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে। রাজপ্রাসাদের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে প্রায় ছুটেই ঢুকে পড়লো প্রাসাদে। হাতে তার রাজার দেওয়া ছাড়পত্র, কেউ তাকে বাধা দেবার সাহস পেল না।

রাজদরবারে তখন বঙ্গরাজ দনুজমাধবদেব সিংহাসনে বসে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন। আগন্তুক সৈনিক মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, ভীষণ বিপদ উপস্থিত মহারাজ।

বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো রাজসভায়। সিংহাসনে রাজা দনুজমাধবদেবের ভ্রূ দুটিও কুঁচকে উঠলো। সকলের মনের প্রশ্নটা রাজ্যের মহামন্ত্রীই করলেন, কি বিপদ সৈনিক? তবে কি গৌড় রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে তুর্কী সেনারা আবার অভিযান শুরু করেছে আমাদের এই বঙ্গরাজ্যের উদ্দেশে।

আজ্ঞে না মহামন্ত্রী। গৌড়ের তুর্কী শাসক মুঘিসুদ্দীন তুঘাল এখন নিজেই পালিয়েছেন রাজধানী লখনৌতি (লক্ষ্মণাবতী) থেকে। গৌড়ে এসে হাজির হয়েছেন দিল্লী-সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন নিজে। সঙ্গে বিশাল সেনাবাহিনী।

দিল্লী-সুলতান বলবন দিল্লী ছেড়ে নিজে এসেছেন গৌড়ে! আবার একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো রাজসভায়। কিন্তু কেন, কি তাঁর উদ্দেশ্য?

উদ্দ্যেশ্যটা তো বোঝাই যাচ্ছে, এবার মুখ খুললেন প্রধান সেনাপতি, আমরা আগেই সংবাদ পেয়েছি লখনৌতির বর্তমান শাসক তুঘাল বিদ্রোহী হয়েছে। তাই দিল্লীর সুলতান এসেছেন তাকে শায়েস্তা করতে।

কিন্তু সেটাই কি দিল্লীর সুলতানের একমাত্র উদ্দেশ্য? পদ্মা পেরিয়ে এসে এই বঙ্গরাজ্যটাকেও তিনি কি মুঠোয় আনতে চান না? আশঙ্কা প্রকাশ করলো একজন অমাত্য।

এতক্ষণ দনুজমাধবদেব একটা কথাও বলেননি। চুপচাপ বসে রাজসভার বিভিন্ন বিশিষ্ট রাজপুরুষদের মতামত শুনছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকের সভা ভঙ্গ হলো। আপনারা অকারণ ভয় পাবেন না, বলতে বলতে ফিরে তাকালেন আগন্তুক সৈনিকের দিকে। বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার কাছে আমার আরও কিছু শোনার আছে।

আগন্তুক সৈনিক মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বঙ্গেশ্বরের অনুগমন করলো।

এ কাহিনী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের। বখতিয়ার খলজির নবদ্বীপ ও লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর আরও প্রায় আশি বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখনও সমগ্র বাংলা তুর্কীরা জয় করতে পারেনি। তাদের অধিকারে এসেছে শুধুমাত্র পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার কিছু অংশ। তার বাইরে বিশাল বঙ্গ আর বরেন্দ্রভূমিতে তখনও রাজত্ব করছে কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশ।

তুর্কী আক্রমণকারীদের এ সময়ে সবচেয়ে বেশি বেগ যিনি দিয়েছিলেন তাঁর নাম দনুজমাধবদেব। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে তিনি রাজত্ব করতেন। সে আমলে স্থানটি বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। দনুজমাধবদেবের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। এই শক্তিমান রাজা উপাধি নিয়েছিলেন 'অরিরাজ দনুজমাধব'। তিনি ছিলেন যেমন নিপুণ যোদ্ধা, তেমনি বুদ্ধিমান।

দনুজমাধবদেব আগন্তুক অশ্বারোহী সৈনিকের কাছে সব কথা শুনলেন। শুনতে শুনতে তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির রেখা। গৌড়ের বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রাল দিল্লীর সুলতানের সসৈন্যে আসার খবর পেয়েই রাতারাতি গৌড় ছেড়ে পালিয়েছে। তার খোঁজ সুলতান বলবন তখনও পর্যন্ত পাননি। চতুর্দিকে চর পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তুঘ্রল রীতিমত ধূর্ত। সে যে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কেউ জানে না। বলবনের আশঙ্কা তিনি গৌড় ছেড়ে গেলেই সে আবার লখনৌতিতে ফিরে আসবে।

এই সৈনিককে কিছুদিন আগে দনুজমাধবদেবই গৌড় রাজধানীতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানকার খোঁজখবর রাখা। সৈনিক এবারের খবরটা গুরুতর মনে করে নিজেই ছুটে এসেছে।

সব শুনে বেশ খুশিমনেই সৈনিককে পুরস্কৃত করলেন বঙ্গরাজ। সৈনিক কিছুটা অবাক হয়ে বিদায় নিল। বঙ্গরাজ্য সীমানার ওপারে দিল্লীর সুলতানের আসার খবরটা শুনে মহারাজ যে কেন উৎফুল্ল হলেন এটা সেই সৈনিকের মগজে কিছুতেই ঢুকলো না। আসলে সে তো জানে না দিল্লীর সুলতানের গৌড়ে আসার খবর শুনে দনুজমাধবদেব হিসেব কষতে শুরু করেছেন। এতদিন সামনে শত্রু ছিল একজন, এখন হলো দুজন। সেই দুজন আবার পরস্পরের শত্রু। তাহলে লাভটা কার?

সেইদিন সন্ধ্যের পর দনুজমাধবদেব ডেকে পাঠালেন তাঁর রাজ্যের সেরা গুপ্তচর নকুড় দত্তকে। নকুড় এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। দনুজমাধবদেব তাকে যা নির্দেশ দিলেন তা হলো লখনৌতির বিদ্রোহী ও পলাতক শাসক মুঘিসুদ্দীন তুঘ্রাল কোথায় লুকিয়ে আছে তা যেন যত শীঘ্র সম্ভব খুঁজে বার করে বঙ্গেশ্বরকে জানান হয়। তিনি আশা করছেন দিল্লী-সুলতান বলবনের দূত যে কোনো মুহূর্তে তাঁর কাছে হাজির হতে পারে। বঙ্গরাজ দনুজমাধবদেবের এটাই প্রথম হিসেব।

বঙ্গরাজের হিসেব যে খুবই পাকা তা জানা গেল দিনকয়েকের মধ্যেই। সত্যি সত্যি দিল্লী-সুলতানের দূত বঙ্গরাজধানীতে এসে দনুজমাধবদেবকে বলবনের বার্তা দিল। বলবন তাঁর চিঠিতে দনুজমাধবদেবের বিস্তর প্রশংসা করে তাঁকে লখনৌতির রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চিঠির বক্তব্য শুনে মন্ত্রী ও সভাসদরা একবাক্যে বললো, মহারাজ, এ আমন্ত্রণ নয়, এটা একটা ফাঁদ। দিল্লীর সুলতান নিশ্চয়ই মহারাজকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করার মতলব করেছেন। এইভাবেই বোধহয় তিনি বঙ্গরাজ্যটাকে দখল করতে চান।

হেসে দনুজমাধবদেব বললেন, না মাননীয় সভাসদগণ, আমার মনে হয় এটা ফাঁদ নয়। সুলতান বলবনের এখন আমার সাহায্য সত্যিই বড় দরকার। তাঁর আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম।

আমি তাহলে সুলতানকে সেই কথাই বলি? সুলতান-দূত উৎফুল্লভাবে বললো।

হ্যাঁ, তবে যেতে পারি দুটি শর্তে।

শর্ত?

হ্যাঁ। প্রথম শর্ত দিল্লীর সুলতানকে মেনে নিতে হবে বঙ্গরাজ দনুজমাধবকে স্বাধীন রাজা হিসাবে। আর দ্বিতীয় শর্ত, সুলতানের দরবারে আমি যখন প্রবেশ করবো সুলতানকে মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে হবে। সুলতান এই দুই শর্তে রাজী থাকলে তবেই আমি লক্ষ্মণাবতী যাব সুলতানের অতিথি হয়ে।

দূতের মুখে শর্তের কথা শুনে জ্বলে উঠলেন সুলতান বলবন। বেয়াদপ! এই কাফেরের শর্ত মানা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু সুলতান, এই মুহূর্তে যে লোকটাকে আমাদের খুবই দরকার! ওর সাহায্য ছাড়া তুঘ্রালকে গ্রেফতার করা খুব মুশকিল। ওই স্থানীয় রাজা জল-জঙ্গলে ভরা এই দেশটাকে খুব ভাল চেনে। বিনীত ভঙ্গিতে বললো একজন প্রধান আমীর।

কিন্তু তাই বলে দিল্লীর সুলতান মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন এক সামান্য রাজার সামনে! এরপর দিল্লী ফিরে এ মুখ কি কাউকে দেখাতে পারবো?

এ ক্ষেত্রে একটা উপায় আছে আলমপনা।

কি উপায় বরবক?

এ হলো গিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।

কথাটা শুনেই চমকে মুখ ঘোরালেন সুলতান, কে, কে বললো কথাটা ?

বক্তা সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। তার নাম বরবক বেকতুর। দরবারের এক বুদ্ধিমান আমীর।

কি উপায় বরবক ?

সুলতানের হুকুম হলে তা একটু গোপনে বলতে চাই।

হুঁ! সুলতান কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, তাহলে এস আমার খাসমহলে।

তখনকার মতো দরবার ভঙ্গ হলো।

সুলতানী দরবারের গোপন খবর জানার আরও গোপন ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন বঙ্গরাজ দনুজমাধবদেব। তাই দিনকয়েক বাদে নকুড় দত্ত মারফত বঙ্গেশ্বর যখন গৌড় দরবারের খবরটা শুনলেন, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। মহারাজের হাসি শুনে নকুড় দত্ত বললো, মহারাজ, এ হলো গিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।

দনুজমাধবদেব বললেন, কিন্তু এভাবে কি সত্যকে ঢাকা যাবে নকুড় ? তবু বলবো পরিকল্পনাটায় চমক আছে।

এর দুদিন পরই সুলতানী দূত আবার এল বঙ্গরাজধানীতে, দিল্লী-সুলতান বলবন বঙ্গরাজের শর্ত মেনেই দনুজমাধবদেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গৌড় রাজধানীতে।

এবার আর দেরি করলো না বঙ্গেশ্বর, কিছু দেহরক্ষী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন লখনৌতির পথে।

দনুজমাধবদেব যখন লখনৌতির রাজদরবারে প্রবেশ করলেন তখন সুসজ্জিত দরবারে আমীর-ওমরাহদের নিয়ে শাহী মসনদে বসে রয়েছেন সুলতান বলবন। তাঁর বাঁ হাতের মণিবন্ধের ওপর শেকলে বাঁধা একটা পোষা বাজপাখি।

বঙ্গরাজ দরবারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী-সুলতান বলবন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর মণিবন্ধ থেকে শেকল খুলে আকাশে উড়িয়ে দিলেন বাজপাখিটা। ভঙ্গিটা এমন যে দরবারের আমীর-ওমরাহরা মনে করলো সুলতান উঠে দাঁড়িয়েছেন হাতের পাখিটাকে উড়িয়ে আকাশ থেকে অন্য পাখি ধরে আনার জন্য। কিন্তু দনুজমাধবদেব ও তাঁর অনুচরেরা জানলো দিল্লীর সুলতান বলবন মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন স্বাধীন বঙ্গরাজ দনুজমাধবদেবকে। অর্থাৎ সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। আমীর বরবক বেকতুর সেদিন বঙ্গরাজের শর্ত মানার সমস্যা মেটাতে সুলতানকে এই বুদ্ধিই দিয়েছিলেন। একেই বলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

এরপর আর দুজনের মধ্যে চুক্তি হতে দেরি হলো না। বলবন দনুজমাধবদেবকে বঙ্গরাজ্যের স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিলেন। এর প্রতিদানে দনুজমাধবদেবও প্রতিশ্রুতি দিলেন বিদ্রোহী তুঘ্রালকে তিনি ধরে দেবার চেষ্টা করবেন।

চুক্তি না হয় হলো, কিন্তু বঙ্গরাজ দনুজমাধবদেব যত সহজে বলবনের কাছে বঙ্গের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন ততটা ইচ্ছা নিয়ে তুঘ্রালকে ধরবার চেষ্টা কি করেছিলেন ? ইতিহাস তা বলে না। 'চেষ্টা করছি, করবো' বলে শুধু সময়ই কাটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে হ্যাঁ, এই সুযোগে অন্ততঃ বেশ কিছুকাল স্বাধীন বঙ্গরাজ্য তুর্কী আক্রমণকারীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল। সার্থক হয়েছিল অরিরাজ দনুজমাধবদেবের রাজনৈতিক কৌশল।

ছবিঃ সুফি

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অধিকাংশ মা-বাপই এই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখেন।

ইউ টি আই-এর চিল্‌ড্রেন্স কলেজ অ্যান্ড কেরিয়ার ফান্ড তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে।

বার্ষিক সমাবর্তন-সভা। আপনার এবং আপনার সন্তানের জীবনে পরম উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। এবার তাকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে তুলেছে ইউ টি আই, তাদের চিল্‌ড্রেন্স কলেজ অ্যান্ড কেরিয়ার ফান্ড-এর মাধ্যমে।

আপনার সন্তানের বয়স যদি 15'র কম হয়, আপনি এখন থেকেই বিনিয়োগ করে, ওর ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ শুরু করে দিতে পারেন। এর দৌলতে ও কলেজের বিভিন্ন ধাপ পর-পর এগিয়ে যেতে পারবে কিংবা জীবন গড়ার কাজ শুরু করে দিতে পারবে। ফান্ডের সময়ানুসার টাকা তোলার সুযোগ-সুবিধা, ঠিক যখন যেমন দরকার ঐসব টিউশন ফী এবং অন্যান্য সব ফী মেটাতে সাহায্য করবে। আপনি বছরের পর বছর যত বিনিয়োগ করবেন, ওর ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ফান্ড অবিরত বাড়তেই থাকবে, কারণ ইউ টি আই আপনার টাকা এমনভাবে বিনিয়োগ করবে যে আপনার সন্তানের সাথে-সাথে বিনিয়োগও বাড়তেই থাকবে।

বৈ শি ষ্ট্য স মূ হ

● এক খোলা-অবধির যোজনা। ● 15 বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের জন্য যোজনা। 18 থেকে 23 বছর বয়সের মধ্যে সময়ানুসার কিস্তিতে টাকা তোলার সুবিধা। ● প্রতি ইউনিট 10 টাকা, কমপক্ষে বিনিয়োগ 2000 টাকা, এবং তারপরে 500 টাকার গুণিতকে। ● ফান্ডের বৃদ্ধি সময়ে সময়ে বোনাস ইউনিট-রূপে জমা করা হবে। ● প্রতি বছরে দুইবার আংশিক টাকা তোলা মঞ্জুর—18 বছর বয়সে 50%, এবং প্রতি বছরে অতিরিক্ত 10% করে, 23 বছর বয়স অবধি। ● অন্য সন্তানেরও নামে নমিনেশনের সুবিধা।

আমার সন্তানের কলেজের শিক্ষার জন্য আমি এখন থেকেই প্রস্তুত হতে চাই।

অনুগ্রহ করে ফান্ডের তথ্যপূর্ণ ব্রশিওর-যুক্ত- আবেদনপত্র আমাকে পাঠাবেন।

নাম ____________________

পদ/জীবিকা ____________________

ঠিকানা ____________________

____________________ পিন কোড ____________

ফোন : অফিস ____________ গৃহ ____________

অনুগ্রহ করে এই কুপনটি আপনার নিকটতম আমাদের অফিসে পাঠান—বাঁদিকের ঠিকানাগুলি দেখলেই পাবেন।

SUK

UNIT TRUST OF INDIA

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

আপনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্যে

সব সিকিউরিটি বিনিয়োগই বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। সুতরাং বিনিয়োগের আগে আপনার বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা/এজেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

কর্পোরেট অফিস্ : ১৩ স্যার বিঠল দাস ঠাকরসে মার্গ (নিউ মেরিন লাইন্স), **বম্বে** -৪০০০২০ ফো ২০৬৮৪৬৮ **জোনাল্ অফিস্ :** ২ ফেয়ার্লি প্লেস, কলিকাতা -৭০০০০১ ফো : ২২০৯৩৯১ / ৫৩২২ **ব্রাঞ্চ অফিস :** আশানিবাস, ২৪৬ লিউইস্ রোড, ভুবনেশ্বর ৭৫১০১৪ ফোন ৫৬১৪১ ● ২ ও ৪ ফেয়ার্লি প্লেস্ কলিকাতা -৭০০০০১ ফো : ২২০৯৩৯১ ● তৃতীয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ বিল্ডিং, দোতলা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ ফো : ৮১০২ ● হিন্দুস্থান বিল্ডিং, এম্.এল. নেহরু রোড পান বাজার, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ ফোন : ৫৪৩১৩১ ● ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা বিল্ডিং, বিষ্টুপুর, জামশেদপুর -৮৩১০০১ ফোন : ২৫৫০৮ ● জীবন দীপ বিল্ডিং, এক্সিবিশন্ রোড, পাটনা -৮০০০০১ ফো : ২২২৪৭০ ● জীবন দীপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, ৭৩৪৪০১ ফো : ২৪৬৭১

CHILDREN'S COLLEGE AND CAREER FUND

UNIT PLAN-93

কারণ আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের দায়িত্ব আপনারই

অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ ? কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ?

পেটের গোলমাল ?

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গণ্ডগোল
ও অসুস্থ লিভার। যদি সুস্বাস্থ্য চান –
পেটের গোলমাল সারান
আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

... ডাঃ সরকার

পেটের গোলমাল সারাতে আর লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার–
আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

লিভোসিন

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে **লিভোসিন** এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না-বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর লিভার সুস্থ হয়।

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Jupiter -এর
আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোনঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india **Allen's India**
Marketing Pvt. Ltd.
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India